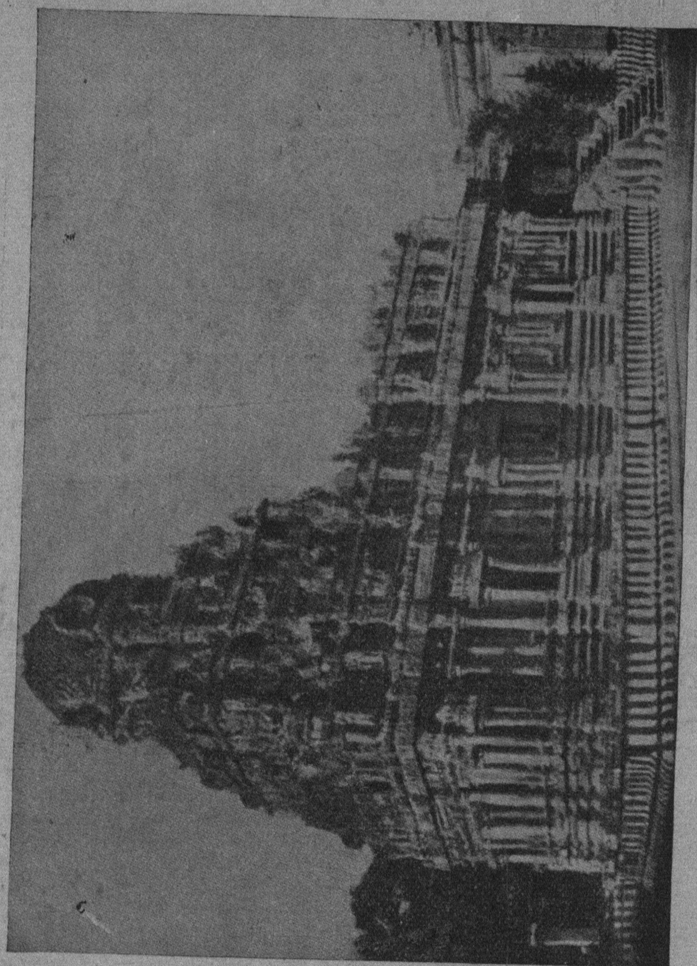


বিচিত্র ভারত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক
শ্রীইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ., পি-এইচ. ডি.
প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার
এবং
সিটি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক
শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ.
প্রণীত

এ. মুখার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স
প্রকাশক ও পুস্তকবিক্রেতা
৬, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

ঠাকুর সর্ব্বানন্দ—



শ্রীশ্রী৺কালীবাড়ী, মেহার।
(সর্ব্বানন্দের সিদ্ধিস্থান।)

প্রকাশক
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
১৮০এ, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ : ১৩৫৭

চিত্রশিল্পী
শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

মুদ্রাকর—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস
৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

ভূমিকা

আমাদের পবিত্র মাতৃভূমির সভ্যতা ও সংস্কৃতির সহিত বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণের সামান্য পরিচয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে। বিষয়টি অতি জটিল; স্থানাভাবে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করা সম্ভব হয় নাই। তথাপি আমরা আশা করি যে আমাদের কিশোর পাঠক-পাঠিকাগণ এই পুস্তক পাঠ করিয়া মাতৃভূমির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইবে।

এই পুস্তক রচনাকালে আমরা কয়েকজন বন্ধুর নিকট যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে সুলেখক শ্রীযুক্ত কনক বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনকৃষ্ণ ঘোষ, সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র রায়, সাংবাদিক ও কবি শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন বসু এবং ঐতিহাসিক গবেষণা ক্ষেত্রে কৃতী শ্রীমান্ কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম কৃতজ্ঞচিত্তে উল্লেখ করিতেছি।

শ্রীইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

অয়ি ভুবনমনমোহিনী!
অয়ি নির্মল সূর্য্যকরোজ্জ্বল ধরণী
জনক-জননী-জননী!

নীল-সিন্ধু-জল-ধৌত চরণতল
অনিল-বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল
অম্বর-চুম্বিত ভাল হিমাচল
শুভ্র-তুষার কিরীটিনী!



প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে
জ্ঞানধর্ম্ম কত কাব্যকাহিনী!

চির কল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
দেশ-বিদেশে বিতরিছ অন্ন
জাহ্নবী-যমুনা-বিগলিত করুণা
পুণ্যপীযূষ স্তন্যবাহিনী!

বিচিত্র ভারত

"হেথায় আর্য্য, হেথা অনার্য্য
হেথায় দ্রাবিড়, চীন—
শক হুন-দল পাঠান মোগল
এক দেহে হ'লো লীন।"
—রবীন্দ্রনাথ

সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা এই ভারতবর্ষ আমাদের জন্মভূমি।

ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক সীমা যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। মৌর্য্য সম্রাট্‌গণের রাজত্বকালে আফ্‌গানিস্থান ও বেলুচিস্থান ভারতবর্ষের সহিত সংযুক্ত ছিল; বহুদিন পরে মুঘল আমলে আবার এই দুইটি দেশ ভারতীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্ত্তমান সময়ে বেলুচিস্থান ভারতবর্ষের অন্তর্গত, কিন্তু আফ্‌গানিস্থান ভারতের বাহিরে একটি স্বাধীন রাজ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আফ্‌গানিস্থানের অধিপতি আহম্মদ শাহ্‌ আব্‌দালী পঞ্জাব অধিকার করেন। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে পঞ্জাবে স্বাধীন শিখরাজ্য প্রতিষ্ঠিত না হইলে হয়তো ভারতের এই প্রদেশটি অদ্যাপি আফ্‌গানিস্থানের অঙ্গীভূত থাকিত।

উত্তর-পূর্ব্বে আসাম চিরদিনই ভারতবর্ষের অংশরূপে পরিগণিত। পূর্ব্বে এই প্রদেশের নাম ছিল কামরূপ। হিন্দুদের প্রাচীন কাব্য,

পুরাণ প্রভৃতিতে কামরূপের বহু কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। খৃষ্টীয়



চেরাপুঞ্জীর একটি জলপ্রপাত (আসাম)

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শান জাতির শাখা আহোম জাতি কামরূপ

অধিকার করিয়া তথায় স্থায়িভাবে বাস করিতে থাকে। তাহাদের নাম অনুসারে এই প্রদেশের নাম হইল আসাম। কালক্রমে আহোমগণ হিন্দুর ধর্ম্ম ও ভাষা গ্রহণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় হইয়াছে।

আসামের পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ। ব্রহ্মদেশের সহিত ভারতীয় সভ্যতার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান আছে। ব্রহ্মদেশের দক্ষিণ অংশে বহু ভারতীয় নর-নারী উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ব্রহ্মদেশের উত্তর অংশ ভারতীয়দের পক্ষে দুরধিগম্য হইলেও সেখানে তাহাদের যাতায়াত ছিল। বর্ত্তমানে ব্রহ্মদেশের অংশরূপে পরিগণিত আরাকানের অধিবাসী মগদের অত্যাচারের কাহিনী বঙ্গদেশে সুপরিচিত। তথাপি ইংরেজ আমলের পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক সীমার অন্তর্গত ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে তিনটি যুদ্ধের ফলে সমগ্র ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হয় এবং শাসনকার্য্যের সুবিধার্থ ইহা ভারত সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশরূপে পরিগণিত হয়। সম্প্রতি রাজনৈতিক কারণে ব্রহ্মদেশকে পুনরায় ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে।

ভারতবর্ষের সংলগ্ন নীল সাগরের বুকে আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং সিংহল দ্বীপ। আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ব্রিটিশ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইহা রাজনৈতিক হিসাবে ভারতবর্ষের অন্তর্গত হইয়াছে। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে দাক্ষিণাত্যের দিগ্বিজয়ী রাজা রাজেন্দ্র চোলের নৌ-বাহিনী এই দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিয়াছিল। সিংহলের সহিত ভারতবর্ষের সংস্কৃতিগত সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। ইহা রামায়ণের লঙ্কা, বাঙ্গালী বীর বিজয়সিংহের কীর্ত্তি-কেন্দ্র। বর্ত্তমানে সিংহল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলেও ভারতবর্ষের সহিত ইহার শাসনগত কোন সম্বন্ধ নাই।

ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা প্রকৃতির করুণায় সুনির্দ্দিষ্ট। উত্তরে, উত্তর-পূর্ব্বে এবং উত্তর-পশ্চিমে বিশাল হিমালয় পর্ব্বতমালা এবং তৎসংশ্লিষ্ট গিরিশ্রেণী দুরতিক্রম্য প্রাচীররূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে এই পর্ব্বতমালার উৎপত্তি হইয়াছে; যে অঞ্চলে এই পর্ব্বতমালা দণ্ডায়মান তাহা যখন সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল তখনও দাক্ষিণাত্যের অধিত্যকা সমুন্নত



মাউণ্ট এভারেষ্ট (হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ)

মস্তকে বর্ত্তমান ছিল। সমুদ্রগর্ভ ভেদ করিয়া পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতশিখর হিমালয় উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা ভাবিলেও মনে অপূর্ব্ব বিস্ময়ের উদয় হয়। যাহা হউক, হিমালয় পর্ব্বতমালা ও তৎসংশ্লিষ্ট গিরিশ্রেণী যে ভারতবর্ষকে পৃথিবী হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে ইহা মনে করা ভুল। উত্তর-পূর্ব্ব গিরিপথ অতিক্রম

করিয়া প্রাগৈতিহাসিক যুগে একাধিক অসভ্য জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছে; ঐতিহাসিক যুগেও আহোম জাতি ঐ পথেই আসামে উপস্থিত হইয়াছে। উত্তরে তিব্বতের সহিত ভারতীয়গণের বিশেষ পরিচয় ছিল। হিমালয় অতিক্রম করিয়া কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় তিব্বতের কিয়দংশ জয় করিয়াছিলেন। হিমালয় অতিক্রম করিয়াই বাঙ্গালী মনীষী দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতে যাইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। উত্তর-পশ্চিম গিরিপথগুলি অতিক্রম করিয়া যে সকল জাতি ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াছিল



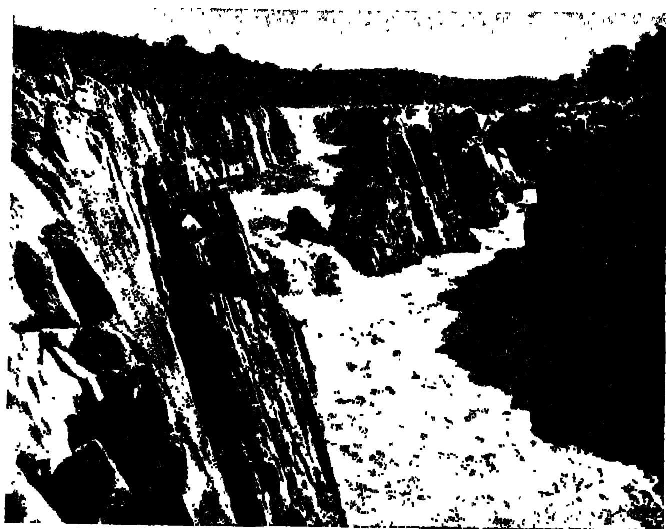
খাইবার গিরিপথে সামরিক পথ ও রেলওয়ে

তাহাদের কাহিনী ইতিহাসে সুপরিচিত। দ্রাবিড়, আর্য্য, পারসিক, গ্রীক, শক, পহ্লব, কুষাণ, হূণ, আরব, তুর্কী ও আফ্‌গান জাতি বিভিন্ন যুগে উত্তর-পশ্চিম পথে আমাদের দেশে আগমন করিয়াছে।

পশ্চিমে ও দক্ষিণে ভারতবর্ষ সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। ভারতবর্ষের উপকূল প্রায় ৫০০০ মাইল দীর্ঘ। ইউরোপের উপকূলের সহিত তুলনা

করিলে ভারতবর্ষের উপকূল অপেক্ষাকৃত ঋজু মনে হইবে; তাই ভারতের সুদীর্ঘ উপকূলে ইউরোপের ন্যায় অত বেশী বন্দর ও পোতাশ্রয় নির্ম্মিত হইতে পারে না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সমুদ্র-তীরনিবাসী ভারতবাসীরা প্রাচীন গ্রীক ও বর্ত্তমান ইংরেজ জাতির ন্যায় বাণিজ্যপ্রিয় ও নৌ-বলে বলীয়ান্ হয় নাই। প্রাচীনকালে হিন্দুরা যে জলপথে বাণিজ্যযাত্রা করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্রহ্মদেশ, সুমাত্রা, যাভা, কম্বোডিয়া প্রভৃতি স্থানে হিন্দুরা জলপথেই যাতায়াত করিতেন। বিজয়সিংহ জলপথেই সিংহলে উপস্থিত হইয়া তথায় রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক অনুমান করেন যে ভারত মহাসাগরের কয়েকটি দ্বীপে গুপ্ত সম্রাট্‌গণের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজেন্দ্র চোলের নৌ-বাহিনী আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, ব্রহ্মদেশের কিয়দংশ এবং সুমাত্রা দ্বীপ জয় করিয়াছিল। মাদুরার পাণ্ড্যরাজা জটাবর্ম্মা সুন্দরপাণ্ড্য জলপথে মালয় উপদ্বীপ পর্য্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। এই সকল ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত উপেক্ষা না করিয়াও আমরা বলিতে পারি যে সমুদ্রযাত্রায় হিন্দুরা ইউরোপীয়দের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে কলম্বস, ভাস্কো দা গামা, ড্রেক প্রভৃতি ইউরোপীয় নাবিকগণ অসীম সাহসে নির্ভর করিয়া অজ্ঞাতপথে যাত্রা করিয়াছেন এবং নূতন দেশ ও নূতন পথ আবিষ্কার করিয়া অমর কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু কোন ভারতীয় নাবিক এরূপ সাহস ও কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই। মুসলমান আমলে ভারতবাসীরা নৌ-বল সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন হইয়া পড়ে। ফলে আরব সাগরে এবং ভারত মহাসাগরে ইউরোপীয় বণিক্‌দের—বিশেষতঃ পর্ত্তুগীজ ও ইংরেজদের—প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজ বণিকেরা মহাপরাক্রান্ত

সম্রাট্ ঔরংজীবকেও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তাহারা আরব সাগরে মুসলমান বণিক্‌দের জাহাজ লুণ্ঠন করিত, মক্কা-যাত্রীরাও নিষ্কৃতি পাইতেন না। ঔরংজীব বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে দমন করিতে পারেন নাই। মুঘল সাম্রাজ্য নৌ-বলে বলীয়ান্ না হওয়ার কুফল বাঙ্গালীরা বিশেষভাবে ভোগ করিয়াছিল। পর্ত্তুগীজ



জব্বলপুরের নিকটে নর্ম্মদা নদী Marble Rocks অতিক্রম করিতেছে

এবং মগ জলদস্যুদের অত্যাচারে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ ছারখার হইয়া গেল, মুঘল সম্রাট্‌গণের কর্ম্মচারীরা প্রজাদের ধন-প্রাণ রক্ষা করিতে পারিলেন না। সুন্দরবন অঞ্চল এখন জনমানবশূন্য, শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে পরিবৃত; কিন্তু এক সময় এখানে একটি সমৃদ্ধ জনপদ বর্ত্তমান ছিল। সম্ভবতঃ জলদস্যুদের অত্যাচারেই এই অঞ্চলের এরূপ দুরবস্থা

ঘটিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে মারাঠাগণ নৌ-বলে বলীয়ান্ হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু আত্মকলহ এবং ইংরেজদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাহাদের সর্ব্বনাশ করিল।

ভারতবর্ষ যে সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা, তাহার প্রধান কারণ এদেশে নদীর প্রাচুর্য্য। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই নদীমাতৃক ভূমি বিশেষ উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী হয়। তাই আদিম কালে মানুষ নদীমাতৃক



ধুবড়ীর নিকটে ব্রহ্মপুত্র—আসাম অতিক্রম করিয়া বঙ্গদেশে প্রবেশ করিতেছে

ভূমিতে বাস করিতে ভালবাসিত। ফলে নদীমাতৃক ভূমিতেই পৃথিবীর অধিকাংশ সভ্যতার উৎপত্তি হইয়াছে। নীলনদের উপত্যকা প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার জন্মভূমি। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকা প্রাচীন ব্যাবিলন এবং অ্যাসিরিয়ার সভ্যতার উৎপত্তিস্থল। আর্য্য জাতি ভারতবর্ষে আগমন করিয়া প্রথমে সিন্ধুনদের উপত্যকায় বসতিস্থাপন

করিয়াছিল; পরে গঙ্গার তটভূমি অনুসরণ করিয়া তাহারা ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতে থাকে। নদীমাতৃক বঙ্গদেশ উর্ব্বরতায় ভারতে অতুলনীয়। বিশাল ব্রহ্মপুত্র নদের প্রবাহ উত্তর-আসাম এবং পূর্ব্ব-বঙ্গের উর্ব্বরতার অন্যতম প্রধান কারণ। নদীর অভাবে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি কিরূপে বিলুপ্ত হইয়া যায় তাহার দৃষ্টান্ত রাজপুতানার মরুভূমি। জল নাই, শস্য নাই, তরু-লতা পর্য্যন্ত নাই—চারিদিকে বিশাল বালুকারাশি ধু ধু করিতেছে!



রাজপুতানার মরুভূমি

নদীর গতি পরিবর্ত্তনশীল; জলপ্রবাহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়। সময় সময় কোন নদীর চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়। ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে এদেশের

কোন কোন নদী বিভিন্ন সময়ে গতি পরিবর্ত্তন করিয়াছে। হক্রা নামক একটি নদী বহু পূর্ব্বে হিমালয় হইতে উৎপন্ন হইয়া বর্ত্তমান বাহাওয়ালপুর রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত; এখন তাহার চিহ্নমাত্রও দেখা যায় না। পঞ্জাবের শতদ্রু নদী এখন যে খাতে প্রবাহিত হইতেছে পূর্ব্বে তাহার প্রায় ৮৫ মাইল দূরে ইহা প্রবাহিত হইত। যমুনার নীল জল ভারতের কাব্যে ও ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমানে দিল্লী ও মথুরার নিকটে যমুনার প্রবাহ এত ক্ষীণ যে সম্ভবতঃ পঞ্চাশ বৎসর পরে ঐ অঞ্চলে যমুনার চিহ্নও থাকিবে না। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে যমুনা দিল্লীতে শাহ্‌জাহানের প্রাসাদের পাদদেশে প্রবাহিত হইত; এখন যমুনা ঐ প্রাসাদের বহু দূর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

নদীর গতি পরিবর্ত্তনের বহু দৃষ্টান্ত বাঙ্গালা দেশেও পাওয়া গিয়াছে। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দ এবং ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রেণেল সাহেব বাঙ্গালার যে মানচিত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহার সহিত বর্ত্তমান বাঙ্গালার মানচিত্রের তুলনা করিলে এ সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। রেণেলের সময়ে তিস্তা নদী তিনটি শাখায় প্রবাহিত হইত—ইহাদের নাম করতোয়া, পুনর্ভবা এবং আত্রাই। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে উত্তর-বঙ্গে একটি প্রবল বন্যা হয়। এই বন্যার ফলে তিস্তা নদী প্রাচীন খাত পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হয় এবং ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ব্রহ্মপুত্রের জলধারা ইহার প্রাচীন খাত পরিত্যাগ করিয়া যমুনার সহিত সম্মিলিত হয়। ময়মনসিংহের নিকটে প্রাচীন খাতটি এখনও বর্ত্তমান আছে। গঙ্গার প্রবাহ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন যে বর্ত্তমান ভাগীরথী নদীই আসল গঙ্গা, আবার কাহারও মতে পদ্মা নদীতেই গঙ্গার প্রধান জলধারা প্রবাহিত হইতেছে। পদ্মা নদীর গতিও



ইরাবতী নদী (পঞ্জাব) পর্ব্বত হইতে নির্গত হইতেছে

পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; এক সময়ে ইহা ঢাকার নিকটে মেঘনার সহিত সম্মিলিত হইত।

ভারতবর্ষে কোন আগ্নেয়গিরি নাই, কিন্তু বঙ্গোপসাগরের অন্তর্গত একটি দ্বীপে (Barren Island) আগ্নেয়গিরি আছে। এই আগ্নেয়গিরির ব্যাস প্রায় দুই মাইল, উচ্চতা আনুমানিক ৯০০ ফুট।



আগ্নেয়গিরি (Barren Island)

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে একজন পরিব্রাজক এই দ্বীপে উপস্থিত হইয়া দেখিয়াছিলেন যে আগ্নেয়গিরি হইতে প্রত্যেক দশ মিনিট অন্তর অগ্নিরাশি ও কৃষ্ণবর্ণ ধোঁয়া উদ্গীরিত হয়। ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত মিনবু নামক স্থানে একটি মৃত্তিকা-গঠিত আগ্নেয়গিরি আছে।

প্রকৃতির অফুরন্ত করুণা ভারতকে অপূর্ব্ব শোভায় ও সম্পদে বিভূষিত করিয়াছে!

ভারতবর্ষের বৈচিত্র্য কেবল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে সীমাবদ্ধ নহে। স্মরণাতীত কাল হইতে কত জাতি এই ভূখণ্ডের নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সম্প্রতি নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানের সাহায্যে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উচ্চতা, মস্তকের গঠন, দৈহিক বৈশিষ্ট্য, নাকের পরিমাপ প্রভৃতির আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ভারতভূমিতে আর্য্য, দ্রাবিড়, মঙ্গোল প্রভৃতি বহু জাতির রক্ত-সংমিশ্রণে কালক্রমে এক মিশ্রিত জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। ভারতের স্থানবিশেষে এখনও বিশুদ্ধ বংশধারার সন্ধান হয়তো পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা বিরল বলিলেই চলে।

জাতি-নির্ণয়ের প্রধান মানদণ্ড মস্তকের আকৃতি। মস্তকের আকৃতি দেখিয়া জাতিনির্ণয় বিশেষ সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। কিন্তু সাধারণতঃ জাতির মস্তকের খুলির পরিমাপ বিশেষত্ববোধক। হিমালয় পর্ব্বতমালার উভয় প্রান্তে—পশ্চিমে বেলুচিস্থানে এবং পূর্ব্বে আসামে ও ব্রহ্মদেশে—সাধারণতঃ চওড়া মাথাই দেখিতে পাওয়া যায়। হিমালয়ের দক্ষিণে অবস্থিত ঢালু প্রদেশে মঙ্গোলীয় জাতি বসবাস করে; তাহাদের মস্তকও চওড়া। উক্ত ঢালুপ্রদেশ হইতে দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত কুর্গ পর্য্যন্ত যে প্রদেশগুলি এক সমরেখায় অবস্থিত, তাহাদের অধিবাসীদের মস্তকও উপরিউক্ত বিশেষত্বজ্ঞাপক। পঞ্জাব, রাজপুতানা এবং আগ্রা-অযোধ্যা সংযুক্ত প্রদেশের অধিবাসীদের মস্তক সাধারণতঃ লম্বা ধরণের। বিহার প্রদেশের অধিবাসীদের মস্তক মধ্যম ধরণের। বঙ্গদেশীয় লোকের মস্তক তিব্বতীয়-ব্রহ্ম জাতির মস্তকের মত। বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণের অধিবাসীরা সাধারণতঃ দ্রাবিড় বংশসম্ভূত; তাহাদের মস্তকের গড়ন লম্বা ধরণের—অথবা মধ্যমাকৃতি। কিন্তু

দাক্ষিণাত্যের উপকূলভাগের অধিবাসীদের মধ্যে বিদেশীয় প্রভাব অধিক পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব্ব-উপকূলে মালয় ও ইন্দো-চীনের অধিবাসী এবং পর্তুগীজদের বসবাসের ফলে স্থানীয় দৈহিক বৈশিষ্ট্যের বহু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে, পশ্চিম উপকূলে আরবীয়, পারসিক, আফ্রিকাবাসী, ইউরোপীয় এবং ইহুদী প্রভৃতি বিদেশীয় জাতির সহিত স্থানীয় অধিবাসীদের রক্ত সংমিশ্রণের ফলে তাহাদের সন্তানসন্ততিদের মন, চরিত্র ও অবয়বের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে।

জাতিবিচারের দ্বিতীয় মাপকাঠি নাসিকার পরিমাপ। নাসিকার পরিমাপ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে তিন প্রকার নাসিকা দেখিতে পাওয়া যায়ঃ (১) সরু নাসা, (২) মধ্যম নাসা (সরুও নয়, চওড়াও নয়), (৩) চওড়া নাসা। মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ এবং ছোটনাগপুরের অধিবাসীদের নাসিকা সাধারণতঃ চওড়া। পঞ্চনদ এবং বেলুচিস্থানের অধিবাসীদের নাসিকা সরু। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে, বিশেষ করিয়া পশ্চিম উপকূলস্থ অধিবাসীদের নাসিকা মধ্যম ধরণের। বাঙ্গলাদেশের নিম্নজাতীয় লোকের ভিতর চওড়া নাসিকা দেখিতে পাওয়া যায়। মোটামুটি একথা বলা যায় যে, সরু নাসিকা আভিজাত্যময় উচ্চবংশমর্য্যাদাজ্ঞাপক চিহ্ন এবং চওড়া নাসিকা অনার্য্য লক্ষণ প্রকাশ করে।

জাতিবিচারের তৃতীয় চিহ্ন শারীরিক পরিমাপ। মঙ্গোলীয় জাতিসুলভ চ্যাপ্টা মুখাবয়ব অতি সাধারণ লোকের চক্ষেও ধরা পড়ে। এই মুখাকৃতি দ্বারা উত্তর-পূর্ব্বস্থিত হিমালয়প্রান্তবাসী মঙ্গোলীয় জাতি হইতে বেলুচিস্থান, বোম্বাই এবং কুর্গের চওড়া মস্তকবিশিষ্ট জাতির পার্থক্য সহজেই নির্ণয় করা যায়। ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শারীরিক

দৈর্ঘ্যও বিভিন্ন প্রকার। ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশে—যথা বেলুচিস্থান, পঞ্জাব এবং রাজপুতানায়—সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘকায় জাতির বাসস্থান। উত্তর প্রদেশ হইতে ক্রমশঃ গঙ্গার উপত্যকা ধরিয়া পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকিলে উচ্চতা ক্রমে ক্রমে কমিতে থাকে। আসামের পার্ব্বত্য প্রদেশে গমন করিলে ভারতের ক্ষুদ্রতম পার্ব্বত্য অধিবাসীদিগকে দেখিতে পাই। ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম জাতি আন্দামান দ্বীপের নিগ্রোইটোরা; তাহাদের সাধারণ উচ্চতা পাঁচ ফুটের কম।

এই সকল পরিমাপমূলক চিহ্ন দ্বারা নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ভারতের অধিবাসিগণ নিম্নলিখিত সাতভাগে বিভক্ত।

(১) তুর্ক-ইরাণীয়। বেলুচিস্থান, আফ্গানিস্থান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং পঞ্জাবের যে অংশ সিন্ধুনদের পশ্চিমে অবস্থিত সেখানকার অধিবাসিগণ এই পর্য্যায়ে পড়ে। সম্ভবতঃ তুর্কী এবং পারসিক জাতির রক্ত-সংমিশ্রণে ইহাদের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহারা সাধারণতঃ মুসলমান; ইহারা যুদ্ধপ্রিয় ও হিংস্র প্রকৃতির। ইহাদের উচ্চতা বেশ আছে, গায়ের রঙ ফরসা, চক্ষু প্রায়ই কৃষ্ণবর্ণ, কদাচিৎ ধূসর, মাথা চওড়া, নাক সরু ও খুব লম্বা।

(২) ভারতীয় আর্য্য। পঞ্জাব, রাজপুতানা এবং কাশ্মীরস্থ রাজপুত, ক্ষত্রী এবং জাঠেরা এই শ্রেণীর মধ্যে গণ্য। তাহাদের আকৃতি, ফরসা রঙ্, দীর্ঘ মস্তক, সরু ও উন্নত নাসিকা ঠিক ইউরোপের অভিজাত শ্রেণীর ন্যায়। ইহাদের উচ্চ বা নিম্নশ্রেণীর মধ্যে উচ্চতার সামান্য তারতম্য ভিন্ন কোনই শারীরিক পার্থক্য দৃষ্ট হয় না।

(৩) শক-দ্রাবিড়। উত্তরে সিন্ধুপ্রদেশ হইতে দক্ষিণে মহারাষ্ট্রভূমি পর্য্যন্ত এই জাতির বাসস্থান। মারাঠী ব্রাহ্মণ, কুণ্বী এবং কুর্গবাসীরা



ভারতের বিভিন্ন জাতি

এই শ্রেণীর অন্তর্গত। তাহারা খর্ব্বাকৃতি; কিন্তু তাহাদের মস্তক দীর্ঘ, নাসিকা উচ্চ এবং মুখাবয়ব চ্যাপ্টা।

(৪) আর্য্য-দ্রাবিড় বা হিন্দুস্থানী। পঞ্জাবের পূর্ব্ব অংশ, যুক্তপ্রদেশ এবং বিহারের বাসিন্দারা সাধারণতঃ এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। ভারতীয় আর্য্য ও দ্রাবিড়ী রক্তের সংমিশ্রণের ফলে সম্ভবতঃ এই শ্রেণীর উৎপত্তি

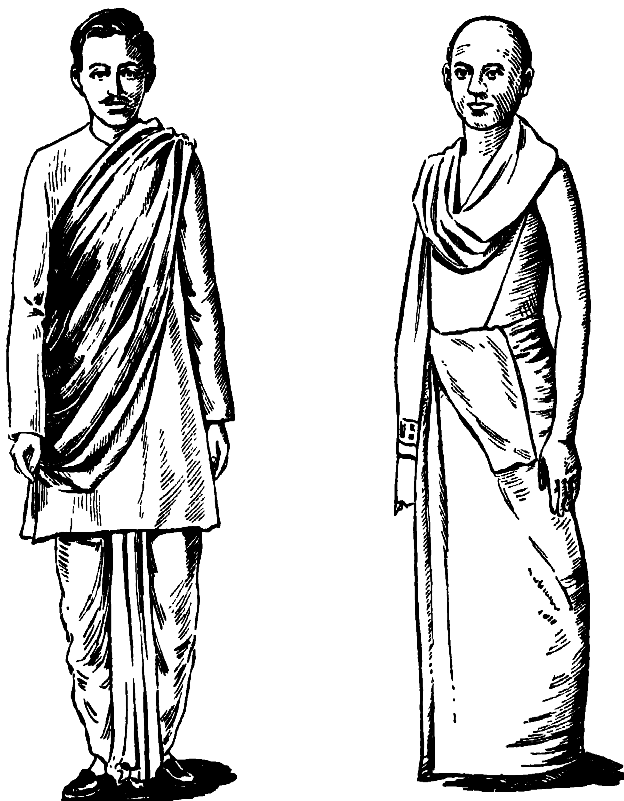
হইয়াছে। উচ্চ শ্রেণীর লোকের ভিতর আর্য্যত্বের ছাপ সুস্পষ্ট; কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর ভিতর দ্রাবিড়ীয় চেহারার বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে।



ভারতের বিভিন্ন জাতি

উচ্চ শ্রেণীর লোকের নাসিকা দীর্ঘ ও সরু; কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর লোকের নাসিকা চওড়া ও ক্ষুদ্রতর।

(৫) মঙ্গোলীয়-দ্রাবিড় বা বাঙ্গালী। এই শ্রেণী সাধারণতঃ বাঙ্গালা এবং উড়িষ্যা প্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুইটি প্রদেশে উচ্চ



ভারতের বিভিন্ন জাতি

শ্রেণীর লোকের মধ্যে আর্য্যত্বের ছাপ আমরা এখনও সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারি; কিন্তু সাধারণ শ্রেণীর লোকের ভিতর প্রচুর তিব্বতীয়-ব্রহ্ম

এবং দ্রাবিড়ীয় রক্ত সংমিশ্রণের ফলে দৈহিক ও মানসিক পরিবর্ত্তন নানা বিষয়েই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। চওড়া মাথা এই অঞ্চলের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই অল্পবিস্তর আছে। ইহাদের রঙ কালো, উচ্চতা মাঝামাঝি, নাক মাঝে মাঝে একটু চওড়া।

(৬) মঙ্গোলীয়। হিমালয়ের নিম্নভূমি, নেপাল, আসাম ও ব্রহ্মদেশের লোকেরা এই শ্রেণীভুক্ত। চওড়া মাথা, কেশহীন চ্যাপ্টা মুখ, ক্ষুদ্র আকৃতি এবং বক্র ভ্রূযুগল ইহাদের বৈশিষ্ট্য।

(৭) দ্রাবিড়। দক্ষিণ-পূর্ব্ব ভারত হইতে সিংহল পর্য্যন্ত এই শ্রেণীর লোকের বাস। মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ, মধ্যপ্রদেশ ও মধ্যভারত এবং ছোটনাগপুরে ইহাদের সাধারণ বাসভূমি। ছোটনাগপুর এবং মালাবারেই প্রাচীন দ্রাবিড়গণের আসল বংশধরেরা বাস করিয়া থাকে। অন্যান্য স্থানে দ্রাবিড় রক্তের সহিত আর্য্য, শক এবং মঙ্গোলীয় রক্তের প্রচুর সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। যাহা হউক, বর্ত্তমানে যাহাদিগকে দ্রাবিড় বলা হয় তাহাদের গাত্রবর্ণ কৃষ্ণ, উচ্চতা সাধারণ হইতেও কম, মস্তকে প্রচুর কৃষ্ণ কেশরাশি, মস্তক লম্বা ধরণের, চক্ষু কৃষ্ণ, নাসা চওড়া।

পৃথিবীর কোন দেশেই এখন অবিমিশ্র জাতি নাই; বিভিন্ন জাতির রক্ত-সংমিশ্রণে মিশ্র জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই মন্তব্য বিশেষভাবে সত্য। ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে বহু জাতি এই দেশে আসিয়া ক্রমে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। উপরে যে সাতটি শ্রেণীর উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাদের উৎপত্তির বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া যায়।

স্মরণাতীত কালে ভারতবর্ষে যে সকল জাতি বাস করিত তাহাদের

দৈহিক গঠন সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ এখন পাওয়া যায় না। পরে বেলুচিস্থান অতিক্রম করিয়া দ্রাবিড় জাতি এদেশে উপস্থিত হয়। কালক্রমে আর্য্য জাতি উত্তর ভারতে আসিয়া দ্রাবিড়দিগকে বিতাড়িত করিয়া বসতি স্থাপন করে। দ্রাবিড়গণ তখন দাক্ষিণাত্যে যাইয়া সেখানকার আদিম অধিবাসীদিগকে পরাজিত করে এবং তথায় বাস করিতে থাকে। নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বলেন যে জাতি হিসাবে এই আদিম অধিবাসীদের সহিত সিংহল, সুমাত্রা এবং অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের ঐক্য আছে।

আর্য্যগণ ভারতে বিদেশী বটে, কিন্তু ভারতকেই তাঁহারা স্বদেশ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাকেই মাতৃভূমি বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন। পুত্রকলত্রসহ ইহুদীদের প্যালেষ্টাইনে প্রবেশের মত তাঁহারা ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দ্বার দিয়া এদেশে আগমন করিয়াছিলেন। এদেশে স্থায়িভাবে বসতিস্থাপন করিবার পর তাঁহারা ভারতের পূর্ব্বতন অধিবাসী দ্রাবিড়দের মেয়েদিগকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন। ফলে আর্য্যরক্তের সহিত দ্রাবিড়রক্তের সংমিশ্রণ হয়। বর্ত্তমানে যাহাদিগকে 'আর্য্য-দ্রাবিড়' বা হিন্দুস্থানী বলা হয় তাহাদের উৎপত্তির ইহাই ঐতিহাসিক কারণ।

বাঙ্গলাদেশের মঙ্গোল-দ্রাবিড়ীয় অধিবাসীদের উৎপত্তির কোন বিশেষ প্রমাণ না দিলেও চলে। এদেশের আদিম বাসিন্দারা দ্রাবিড়, ইহা নিঃসন্দেহ; ইহাদের সহিত উত্তর-পূর্ব্ব গিরিপথে আগত তিব্বতীয়-ব্রহ্ম জাতির রক্তসংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। পরে আর্য্য-সভ্যতা উত্তর ভারত হইতে বঙ্গদেশেও বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং আর্য্যজাতীয় যাজক ও ভদ্র শ্রেণীর লোকজনও এদেশে আগমন করিতে থাকে। ফলে দ্রাবিড়, মঙ্গোল ও আর্য্য জাতি মিলিত হইয়া এক নূতন জাতির

উৎপত্তি করে। এখনও কোন কোন বাঙ্গালীর সরু নাসা, শারীরিক বর্ণ ও গঠন-সৌন্দর্য্যে আর্য্যরক্তের সন্ধান পাওয়া যায়।

শক-দ্রাবিড়দের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম ভারতে যে শকগণ বহুদিন রাজত্ব করিয়াছিল তাহাদের সহিত মহারাষ্ট্র অঞ্চলের দ্রাবিড়দের রক্ত-সংমিশ্রণের ফলেই এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল। অন্যান্য ঐতিহাসিকের মতে স্মরণাতীত কালে পশ্চিম এশিয়া হইতে অ্যাল্পাইন নামক জাতি ভারতবর্ষে আসিয়াছিল; তাহাদের সহিত দ্রাবিড়দের মিলনের ফলেই বর্ত্তমানে শক-দ্রাবিড় নামে অভিহিত জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

মুসলমান শাসনকালে বহু হিন্দু নানা কারণে ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল; ভারতের বর্ত্তমান মুসলমান অধিবাসিগণের অধিকাংশই তাহাদের বংশধর। বিদেশ হইতে যে সকল মুসলমান ভারতবর্ষে আসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই তুর্কীজাতীয়। আফ্গানিস্থান হইতে আগত আফ্গান বা পাঠানেরা প্রধানতঃ উত্তরভারতে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। আরবজাতীয় মুসলমানদের প্রধান উপনিবেশ ছিল সিন্ধুদেশে ও বোম্বাই উপকূলে। এতদ্ব্যতীত পারস্য ও আবিসিনিয়া হইতে বহু মুসলমান ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। এক সময়ে দাক্ষিণাত্যে ও বঙ্গদেশে আবিসিনিয়ার অধিবাসী হাবসীগণ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

বিভিন্ন জাতীয় মানুষের বাসস্থান এই ভারতবর্ষে স্বভাবতঃই বিভিন্ন ভাষার প্রচলন হইয়াছে। আর্য্য জাতি ভারতে আগমন করিয়া প্রথমে পঞ্চনদে বসতি স্থাপন করে; পরে ধীরে ধীরে গঙ্গাযমুনা-বিধৌত

সমতল ক্ষেত্রে তাহাদের অধিকার স্থাপিত হয়। রাজনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ভাষাও ক্রমে ক্রমে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। যে ভাষায় বৈদিক সংহিতাগুলি রচিত তাহার নাম ছন্দঃ। এই ভাষাই ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত ও পূর্ণাঙ্গ হইয়া সংস্কৃত নামে পরিচিত হয়। পাণিনির ন্যায় ব্যাকরণবিদ্‌গণ এবং যাস্কের ন্যায় শব্দতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গড়িয়া তোলেন। সংস্কৃত কখনও কথ্য ভাষা রূপে প্রচলিত ছিল কি না, ইহা লইয়া নানা মত প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন যে ইহা ইউরোপে মধ্যযুগে প্রচলিত ল্যাটিন ভাষার মত লিখ্য বা দ্বিতীয় ভাষা রূপেই ব্যবহৃত হইত। সংস্কৃত কথিত ভাষারূপে ব্যবহৃত হইলেও ইহার প্রচলন শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজেই সীমাবদ্ধ ছিল; জনসাধারণ কথাবার্ত্তায় প্রাকৃত ভাষা ব্যবহার করিত। সংস্কৃত নাটকে স্ত্রীলোক ও অশিক্ষিত পাত্র-পাত্রীর উক্তি প্রাকৃত ভাষায় লিখিত। বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন স্থানে প্রাকৃত ভাষার বিভিন্ন রূপ হইয়াছিল। পালি ভাষা প্রাকৃতেরই একটি রূপ। বৌদ্ধদের ধর্ম্মগ্রন্থাদি পালি ভাষায় রচিত।

প্রাকৃত আধুনিক ভারতীয় আর্য্য ভাষাসমূহের জন্মদাতা। ভারতের বিভিন্ন অংশে আর্য্য জাতির উপনিবেশ স্থাপিত হইলে প্রাকৃতভাষী আর্য্যগণের সহিত ভারতের প্রাচীনতর অধিবাসীদের সংস্পর্শ ঘটিল এবং কতকগুলি মিশ্রভাষার সৃষ্টি হইল। এই সকল ভাষাই বর্ত্তমান সময়ে ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট আর্য্য-ভারতীয় ভাষা নামে পরিচিত। ইহাদের মধ্যে হিন্দী, বাঙ্গালা, আসামী, উড়িয়া, রাজস্থানী, পঞ্জাবী, সিন্ধী, কাশ্মীরী, মারাঠী ও গুজরাটী প্রধান।

ভারতবর্ষে হিন্দী ভাষাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত। সম্প্রতি কংগ্রেসের চেষ্টায় ইহা ভারতের জাতীয় ভাষারূপে গণ্য হইতেছে।

কিন্তু যাহারা নিজের বাড়ীতে পরিবারের মধ্যে হিন্দী ভাষা ব্যবহার করে তাহাদের সংখ্যা বঙ্গভাষাভাষীদের সংখ্যার চেয়ে কম। গুজরাটী, রাজস্থানী, পঞ্জাবী, বিহারী প্রভৃতি ভাষার সহিত হিন্দী ভাষার সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, এবং যাহারা নিজের বাড়ীতে এই সকল ভাষা ব্যবহার করে তাহারা প্রায়ই বাহিরে হিন্দী ভাষায় কথা বলে। সরকারী রিপোর্টে হিন্দীভাষাভাষীর সংখ্যাবৃদ্ধির ইহাই প্রধান কারণ। আবার হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষাকে সম্মিলিতভাবে 'হিন্দুস্থানী' নাম দিয়া একই প্রধান ভাষারূপে গণ্য করা হয়। হিন্দী ভাষা দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত হয়, উর্দ্দু ভাষা পারসী অক্ষরে লিখিত হয়। হিন্দী ভাষায় সংস্কৃতমূলক শব্দ বেশী ব্যবহৃত হয়, উর্দ্দু ভাষায় আরবী ও পারসী শব্দ বেশী ব্যবহৃত হয়।

মুসলমান রাজত্বকালে উর্দ্দু ভাষার উদ্ভব হইযাছিল। মুসলমানদের ভারত বিজয়ের পর বহুদিন পর্য্যন্ত হিন্দুরা মুসলমানদের ব্যবহৃত তুর্কী, পারসী, আরবী প্রভৃতি ভাষা বুঝিত না, মুসলমানেরাও হিন্দুদের ব্যবহৃত ভাষা বুঝিত না। ইহাতে কাজকর্ম্মের বিশেষ অসুবিধা হওয়ায় কালক্রমে এক মিশ্রিত ভাষার উৎপত্তি হইল। ইহার নামই উর্দ্দু (বা শিবিরে ব্যবহৃত ভাষা)।

বাঙ্গালা প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি লোকের মাতৃভাষা। আসামী এবং উড়িয়া ভাষার সহিত ইহার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। আসামী ভাষা লিখিবার জন্য বাঙ্গালা লিপি ব্যবহৃত হয়; উড়িয়া ভাষার লিপি স্বতন্ত্র। সাহিত্যের দিক হইতে বিচার করিতে গেলে বাঙ্গালাকেই ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাষারূপে গণ্য করিতে হইবে। আর কোন ভাষা এত প্রতিভাশালী লেখকের রচনায় সমৃদ্ধ হয় নাই।

দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড় জাতীয় ভাষা প্রচলিত। দ্রাবিড়গণ আর্য্য

বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার লিপি

કોઈ માણસ ઠીંગણો, લૂલો, લંગડો, કાણો કે આંધળો હોય, મુંગો હોય કે બહેરો હોય, તેમાં તેનો શો દોષ? આપણા અવયવો નો કરનાર તો ઈશ્વર છે. એમાં આપણું કંઈ ચલણ નથી. હવે જેમાં જેનું ચલણ નહિ. તેમાં તેનો દોષ કાઢીને તેને હસી કાઢીએ, તો અન્યાય કીધો

গুজরাটী

ସମୟରେ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ସହଧର୍ମ୍ମିଣୀ ଓ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ତାତ ଉଭୟ ପରଲୋକ ଗମନ କରନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମହାଶୋକରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହୋଇ ଥିଲା। ଏହି ଦାରୁଣ ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ମହାଶୋକ ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଧର୍ମ୍ମପ୍ରଚାର ଲାଗି ମଦିନା ନଗରୀକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ସୌଭାଗ୍ୟ କ୍ରମେ

উড়িয়া

పెట్టుచున్నను, హ్యాంలెటు తనకు మురిపించు బిడ్డఁడు. నీసౌందర్యవిలసనము, మాహ్యాంలెటునొక్క — దుండగములకుఁ గారణమైయుండును. అగుపక్షమున, నీసుగుణము లతనిని యథామతికిఁదిరిగి దింపిన ముడల నాథన్యత యింతయంత యనరాదు. అని ఒఫీలియాతో ననెను.

তেলেগু

ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗವು ಪರಿವರ್ತನಕಾರರ ಉಪೋದ್ಘಾತವಾಗಿದೆ. ಈ ಉಪೋದ್ಘಾತವು ಮೂಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವುದೇ ಇದರ ವಿಶೇಷ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳಾದರೋ, ೧೯೧೪ ನೆಯ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ವಿಚಾರ ಮೊದಲ್ಗೊಂಡು ಮುನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆಯ ವಿಚಾರದ ವರೆಗೂ ಹಬ್ಬಿವೆ. ಪರಿವರ್ತನಕಾರರು

কানাড়ী

আধুনিক ভারতীয় ভাষার লিপি

*பாதர் பாத்துவாசருடைய ஆச்சிரமத்தில் தங்குவதாகத் தீர்மா
னம் செய்கிற விருந்தை நீர் அங்கீகரிக்கவேண்டுமே என்றார். பாதர்
மஹாநுபாவரே! முன்னமே எனக்கு விருந்து செய்தாயிற்று.
அர்க்கியம் பாத்தியம் ஆசமனீயம் முதலியன கொடுத்து உபசரித்தீரே!*

তামিল

**കോയമ്പത്തൂർ മലകളിൽ ഒരു കൂട്ടരുണ്ട്. അവർ
തങ്ങൾ ഇരുളരാണെന്ന് പറയും. സാമാന്യം എന്ത
എറച്ചിയും തിന്നും. പശു, പൂച്ച, തവള, കരടി
വെള്ളക്കുരങ്ങൻ ഇതിനെ തിന്നുകയില്ല. ജാതിക്കൂട്ടം**

মালয়ালম্

"ਓਵਲਟਾਈਨ" ਕੁਦਰਤੀ ਅਛੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ
ਸਤ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਪਕੇ ਹੋਏ ਜੌਂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਰ। ਖਾਲਸ ਗਊ
ਦੇ ਦੁਧ ਦੀ ਮਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਾਕਤ
ਦੇਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬੜੀ
ਸਵਾਦਿਕ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹਜ਼ਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ॥

"ਓਵਲਟਾਈਨ" ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ
ਕਰਦਿਆਂ ਹਥ ਤੀਕ ਭੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੀ ਸੁਧ
ਅਤੇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰਕ ਹਿਸਿਆਂ

গুরুমুখী

လွန်လေပြီးသောအခါ။ ဗာရာဏသီပြည်မှ မင်းမဝေးသော
အရပ်၌ အမွန်ရှည်သော မြစ်သည်ရှိ၏။ ထိုမြစ်၏ ဤမှာ
ဘက်ကမ်းနား၌နေသော ဒဂါမဟု ဆိုအပ်သော တခုသော
တငါရွာသည်ရှိ၏။ ထိုမှာဘက်ကမ်းနား၌လည်း တံငါရွာ

ব্রহ্মদেশের লিপি

জাতির নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া বিজেতার ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি বহুল পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু নিজস্ব ভাষা বিসর্জ্জন দেয় নাই। বর্ত্তমানে যে সকল দ্রাবিড়জাতীয় ভাষা প্রচলিত আছে তাহাদের মধ্যে চারিটি প্রধান—তামিল, মালয়ালম্, তেলেগু, কানাড়ী। দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্ব উপকূলে এবং সিংহলের উত্তরাংশে তামিল ভাষা প্রচলিত। দাক্ষিণাত্যের কুলিরা বৃহত্তর ভারতে এই ভাষা ছড়াইয়া দিয়াছে। সাহিত্যের দিক হইতে এই ভাষা বিশেষ সমৃদ্ধ। ইহার নিজস্ব বর্ণমালা পর্য্যন্ত আছে। মালয়ালম্ তামিলেরই একটি শাখা। ইহা সংস্কৃত হইতে শব্দ ধার করিয়া সমৃদ্ধ হইয়াছে। মহীশূর ও তৎ-সন্নিকটস্থ স্থানের ভাষা কানাড়ী। ইহার বর্ণমালা তেলেগুর মত। ইহার প্রাচীন সাহিত্য আছে। তেলেগু ভাষার নিজস্ব সাহিত্য আছে। তেলেগু বর্ণমালা দেবনাগরী হইতে গৃহীত।

ভারতের আদিম অধিবাসীদের ব্যবহৃত কতকগুলি ভাষা এখনও বনে-জঙ্গলে অসভ্য ও অর্দ্ধসভ্য জাতিদের মধ্যে বাঁচিয়া আছে। ইহারা দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত—কোলেরীয় এবং তিব্বত-ব্রহ্ম। কোলেরীয় ভাষাগুলির মধ্যে সাঁওতালী ভাষা প্রধান। তিব্বত-ব্রহ্ম জাতীয় ভাষাগুলি আসাম, সিকিম, নেপাল প্রভৃতি স্থানে পার্ব্বত্য অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়।

সরকারী হিসাবে দেখা যায় যে ভারতবর্ষে দুই শত পঁচিশটি ভাষা প্রচলিত আছে। এই সকল ভাষা যে চারিটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় তাহা উপরে বলা হইয়াছে। ভাষাগত ঐক্যের অভাব ভারতে জাতীয় উন্নতির একটি প্রধান অন্তরায়। হিন্দী ভাষা কখনও সমগ্র ভারতে প্রচলিত হইবে না, কারণ দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়জাতীয় ভাষাগুলির সহিত ইহার কোনই সাদৃশ্য নাই। ইংরেজী ভাষা

মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের পক্ষেই ব্যবহার করা সম্ভব। এই সমস্যার সমাধান কিরূপে হইবে বলা যায় না। কিন্তু ভাষাগত ঐক্য না থাকিলে যে রাজনৈতিক ঐক্য হয় না এই ধারণা ভুল। সুইজার্ল্যাণ্ড অতি ক্ষুদ্র দেশ। সেখানে তিনটি ভাষা (ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইতালীয়) প্রচলিত; কিন্তু ইহাতে জাতীয় ঐক্য ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সুতরাং ভারতবর্ষের মত বৃহৎ দেশে দশ-বারটি প্রধান ভাষা প্রচলিত থাকা মারাত্মক নহে।



অশোকের একটি শিলালিপি (ব্রাহ্মী)

প্রাচীন ভারতে দুইটি প্রধান লিপি প্রচলিত ছিল—ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী। অশোকের শিলালিপিতে দুইটি লিপিই ব্যবহৃত হইয়াছে।

খরোষ্ঠী লিপি দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত হইত। উত্তর-পশ্চিম ভারত, আফ্‌গানিস্থান ও তুর্কীস্থানে এই লিপি ব্যবহৃত হইত। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পর খরোষ্ঠী লিপির প্রচলন বন্ধ হইয়া যায়। সম্ভবতঃ এই লিপি ভারতের বাহিরে উৎপন্ন হইয়াছিল এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে পারস্য-সম্রাটের অধিকার স্থাপিত হওয়ায় ইহা ভারতের ঐ অঞ্চলে প্রচলিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মী লিপির উৎপত্তি খুব সম্ভবতঃ এদেশেই হইয়াছিল, কিন্তু কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত ইহাকে বিদেশাগত বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। এই লিপি বাম হইতে দক্ষিণে লিখিত হইত। ভারতে বর্ত্তমান সময়ে যে সকল বর্ণমালা প্রচলিত আছে তাহার অধিকাংশই ব্রাহ্মী লিপি হইতে উদ্ভূত।

বৈচিত্র্যের লীলাভূমি এই ভারতবর্ষে বহু ধর্ম্ম প্রচলিত আছে। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিগণের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ভারতের লোকসংখ্যার শতকরা প্রায় ৭০ জন হিন্দু। হিন্দুধর্ম্ম বিভিন্ন প্রদেশে পরিবর্ত্তিত রূপ গ্রহণ করিলেও মূলতঃ ইহা এক। বৈদিক ধর্ম্ম হইতে ইহার উৎপত্তি, সংস্কৃত ভাষা ইহার বাহন।

প্রাচীনকালে হিন্দুধর্ম্ম যে সকল শাখায় বিভক্ত হইয়াছিল তাহার মধ্যে বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত সম্প্রদায় প্রধান। বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুর এবং শৈবগণ শিবের উপাসক। বাঙ্গালার বৈষ্ণবেরা শ্রীচৈতন্য প্রবর্ত্তিত মতের অনুবর্ত্তী। শৈব সম্প্রদায়ের প্রভাব এখন কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু এক সময়ে দাক্ষিণাত্যে তাহাদের প্রাধান্য ছিল। শাক্তগণ সক্রিয় নারীশক্তির অর্থাৎ প্রকৃতির উপাসনা করিয়া থাকে। শিবঘরণী দুর্গা, কালী বা পার্ব্বতী তাহাদের উপাস্য দেবী। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে

পূর্ব্ববঙ্গে অথবা আসামে এই শক্তিপূজার সর্ব্বপ্রথম প্রচলন হয়। তন্ত্র তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র। যদিও শক্তিপূজার আচারপদ্ধতি পরবর্ত্তী কালে বৈষ্ণব সংস্কারপন্থীরা নিন্দা করিয়া গিয়াছেন, তবুও অদ্যাপি ইহা একশ্রেণীর শিক্ষিত লোকের মধ্যে প্রচলিত আছে। এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম ইহাদ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হইয়াছিল।

যে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইয়া সমগ্র এশিয়ায় প্রচারিত হইয়াছিল তাহা ভারতবর্ষে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। বঙ্গদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চলে এখন কয়েক সহস্র বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বাস করে। জৈনধর্ম্ম রাজপুতানা ও গুজরাটে এখনও বাঁচিয়া আছে। শিখধর্ম্ম পঞ্জাবের বাহিরে প্রচারলাভ করে নাই। বৌদ্ধ, জৈন ও শিখধর্ম্মকে মূলতঃ হিন্দুধর্ম্মের শাখারূপে গণ্য করা যায়।

উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দুধর্ম্মের আর দুইটি নূতন শাখার উৎপত্তি হয়। রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। তাঁহার মৃত্যুর পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেন ইহাকে বর্ত্তমান রূপ প্রদান করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম একেশ্বরবাদী; ইহা যুক্তিবাদীও বটে। প্রধানতঃ খৃষ্টধর্ম্মের প্রতিরোধ ও হিন্দুধর্ম্মের সংস্কারের উদ্দেশ্য লইয়াই ইহার সৃষ্টি হয়। ইহা এক ও অদ্বিতীয় ভগবানে বিশ্বাসী; ইহা মূর্ত্তিপূজা, জাতিভেদ ও হিন্দু সমাজে প্রচলিত বহু প্রথার বিরোধী। এই ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তন না হইলে শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই হয়তো খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন। আর্য্যসমাজের স্থাপয়িতা ছিলেন পঞ্জাবের ৺স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী। বেদই ইহার একমাত্র ধর্ম্মশাস্ত্র। এই ধর্ম্মমতানুসারীরা মূর্ত্তিপূজা ও জাতিভেদের ঘোর বিরোধী; তাহারা সমাজ সংস্কারে খুব উৎসাহী।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে আরবজাতীয় মুসলমানগণ সিন্ধুদেশ

অধিকার করে এবং অনেক মুসলমান সেখানে স্থায়িভাবে বাস করিতে থাকে। দশম ও একাদশ শতাব্দীতে তুর্কীজাতীয় মুসলমানেরা সর্ব্বপ্রথমে শুধু লুণ্ঠন উদ্দেশ্যেই ভারত আক্রমণ করিত। এদেশে বসবাস করিবার বা ইহাকেই মাতৃভূমি করিবার আকাঙ্ক্ষা ইহাদের তখনও হয় নাই। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মহম্মদ ঘোরী দিল্লী ও কনৌজের হিন্দু রাজগণকে পরাজিত করিয়া এদেশে রাজত্ব স্থাপন করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে আকবরের অধীনে মুঘল বংশ দিল্লীর সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সাতশত বৎসরব্যাপী মুসলমান রাজত্বকালে ভারতবর্ষে ইস্‌লাম ধর্ম্ম রাজধর্ম্মরূপে প্রসার লাভ করে। ভারতবর্ষে আজ প্রায় সাত কোটি মুসলমান হিন্দুদের সহিত পাশাপাশি বাস করিতেছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ, সিন্ধু, পঞ্জাব ও বাঙ্গালায় তাহাদের সংখ্যাধিক্য আছে। ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে সিয়া ও সুন্নী নামে দুইটি শ্রেণী আছে। সিয়া হইতে সুন্নীরাই ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ।

ভারতবর্ষের জনসংখ্যার এক মুষ্টিমেয় অংশ অগ্নির উপাসক। তাহাদের ধর্ম্মকে জোরোয়াস্ত্রীয় ধর্ম্ম বলে। পার্শীরা মূলতঃ আর্য্যদের এক শাখা। তাহারা পারস্য দেশে বসবাস করিত, কিন্তু ইস্‌লাম ধর্ম্মের বিজয়যাত্রায় বাধ্য হইয়া তাহারা পারস্য হইতে ভারতবর্ষে আগমন করে। বোম্বাই প্রদেশেই তাহাদের বাসস্থান। ভারতবর্ষে তাহাদের সংখ্যা কয়েক লক্ষ মাত্র। কিন্তু বুদ্ধিবলে ও ধনবলে তাহারা এদেশে নানাবিষয়ে প্রভাব স্থাপন করিয়াছে। পার্শীরা বিশ্বাস করে যে মৃত্যুর পর আত্মা নিজ কর্ম্মানুযায়ী বেহেস্তে বা স্বর্গে অথবা দোজ্‌খে বা নরকে যায়।

দাক্ষিণাত্যের উপকূলভাগে স্মরণাতীতকাল হইতে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী লোকের বাস। ইংলণ্ডে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার হইবার পূর্ব্বেই এই দেশে

খৃষ্টধর্ম্মের প্রসার হইয়াছিল। কথিত আছে, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে পহ্লবরাজ গণ্ডোফারনিসের সময়ে যীশু খৃষ্টের শিষ্য সাধু টমাস ধর্ম্মপ্রচারার্থ ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন; ভারতে ৩০ লক্ষেরও অধিক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী লোক আছে।

ভারতের পার্ব্বত্য অঞ্চলে বহু অসভ্য জাতি আছে। তাহাদের মধ্যে কোন কোনটি প্রেতোপাসক। প্রেতোপাসকগণের সহজাত ধর্ম্মবুদ্ধি বা ধর্ম্মমূলক বৃত্তি আছে, কিন্তু উহা কোন নির্দ্দিষ্ট আকার ধারণ করে নাই। ধর্ম্মসম্বন্ধে তাহাদের অভিজ্ঞতা প্রসূত কোন নির্দ্দিষ্ট ও শৃঙ্খলাবদ্ধ মতবাদ গড়িয়া উঠে নাই; আধিভৌতিক শক্তি সম্বন্ধে কতকগুলি বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে মাত্র। তাহারা মনে করে যে, কতকগুলি অস্বাভাবিক অশরীরী প্রাকৃতিক শক্তি জীবনের চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া আছে। ইহাদের প্রত্যেকের এক একটি বিভাগ আছে ও প্রত্যেক বিভাগের একজন অধিপতি আছে। তাহারা এক একজন কেহ কলেরা, কেহ বসন্ত কেহ বা গোমড়ক ইত্যাদি রোগের অধীশ্বর; তাহাদের কেহ থাকে ঝরণায়, কেহ বা নদীতে, কেহ পাহাড়ে বা বনজঙ্গলে। এই সকল প্রেতোপাসক জাতির মধ্যে ক্রমশঃ খৃষ্টধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছে।

অতি বিচিত্র দেশ এই ভারতবর্ষ। ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বৈচিত্র্য, বিভিন্ন জাতি-ভাষা-ধর্ম্ম-সংস্কৃতির সম্মিলনে বৈচিত্র্য। কিন্তু এই বৈচিত্র্যের অন্তরালে যে মূল ভাবটি রহিয়াছে তাহা ভারতের নিজস্ব। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "ঐক্যমূলক যে সভ্যতা মানবজাতির চরম সভ্যতা, ভারতবর্ষ চিরদিন ধরিয়া বিচিত্র উপকরণে তাহার

ভিত্তি নির্ম্মাণ করিয়া আসিয়াছে। পর বলিয়া সে কাহাকেও দূর করে নাই, অনার্য্য বলিয়া সে কাহাকেও বহিষ্কৃত করে নাই, অসঙ্গত বলিয়া সে কিছুই উপহাস করে নাই। ভারতবর্ষ সমস্ত গ্রহণ করিয়াছে, সমস্তই স্বীকার করিয়াছে। এত গ্রহণ করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে হইলে এই পুঞ্জীভূত সামগ্রীর মধ্যে নিজের ব্যবস্থা, নিজের শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে হয়—ইহাদিগকে একটি মূলভাবের দ্বারা বদ্ধ করিতে হয়। উপকরণ যেখানকার হউক, সেই শৃঙ্খলা ভারতবর্ষের, সেই মূলভাবটি ভারতবর্ষের।”

ভারতের সাহিত্য

ভারতবর্ষ বহু প্রতিভাবান্ কবি ও সাহিত্যিকের জন্মভূমি। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে অতি গৌরবময় স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। কাব্য, উপন্যাস, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক আলোচনা, ধর্ম্মশাস্ত্র, ইতিহাস—বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যে কোনটিরই অভাব নাই। প্রায় চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতে বৈদিক মন্ত্রসমূহের রচনা আরম্ভ হইয়াছিল; অদ্যাপি ভারতের বিভিন্ন অংশে সংস্কৃত ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত হইতেছে। মুসলমান আমলেও বহু সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এই বিশাল পরিপূর্ণাঙ্গ সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নাই।

আরব, তুর্কী ও আফ্‌গান জাতীয় মুসলমানগণ বহুদিন এদেশে রাজত্ব করিয়াছেন। শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ পারসী ভাষায় কথোপকথন করিতেন; শাসনসম্বন্ধীয় চিঠি-পত্র এবং দলিল প্রভৃতিও পারসী ভাষায় লিখিত হইত। বহু হিন্দু সেকালে পারসী ভাষা শিক্ষা করিতেন এবং এই ভাষায় গ্রন্থাদি রচনা করিতেন। সুতরাং ভারতবর্ষে যে বহু পারসী গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। মুসলমানগণ ইতিহাস রচনার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছিলেন। মুসলমান আমলে রচিত পারসী গ্রন্থসমূহের মধ্যে বহু ঐতিহাসিক গ্রন্থ আছে। মিন্‌হাজ্‌উদ্দীন, বরণী, নিজামউদ্দীন, আবুল ফজল, কাফি খাঁ প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণের রচিত গ্রন্থাবলী

অবলম্বন করিয়াই বর্ত্তমান যুগে মুসলমান আমলের ইতিহাস রচিত হইতেছে। বহু মুসলমান কবিও ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে যে সকল প্রাদেশিক ভাষা প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে কয়েকটি মুসলমান আমলে নবজন্ম লাভ করিয়াছিল। মধ্য যুগে ভারতে এক প্রবল ধর্ম্মান্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। প্রাদেশিক ভাষাগুলির পরিপুষ্টি এই আন্দোলনের অন্যতম সুফল। শ্রীচৈতন্য প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রেরণা লাভ করিয়া বাঙ্গালার বৈষ্ণব সাহিত্য রচিত হইয়াছিল। কবীরকে হিন্দী ভাষার অন্যতম জনক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নামদেব, তুকারাম, রামদাস প্রভৃতি সাধুগণ মারাঠী ভাষার এবং শিখগুরুগণ পঞ্জাবী ভাষার উৎকর্ষ সাধন করেন।

প্রাদেশিক ভাষাগুলির মধ্যে কয়েকটি প্রতিপত্তিশালী লেখকগণের রচনায় সমৃদ্ধ। দাক্ষিণাত্যের ভাষাগুলির মধ্যে তামিল এবং উত্তর ভারতের ভাষাগুলির মধ্যে গুজরাটী, পঞ্জাবী, উর্দ্দু, হিন্দী ও উড়িয়ার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বাঙ্গালীর বিশেষ গৌরবের কথা এই যে আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্য বর্ত্তমান ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য। বাঙ্গালার বৈষ্ণব সাহিত্য রস-মাধুর্য্যে অপূর্ব্ব। উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য ভাবধারার সংস্পর্শে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য নবরূপ ধারণ করিয়াছে; মাইকেল-হেম-নবীন-রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবির এবং রামমোহন-ঈশ্বরচন্দ্র-অক্ষয়কুমার-বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি গদ্য লেখকের প্রতিভায় বিশ্ব-সাহিত্যের আসরে আমাদের মাতৃভাষা স্থান লাভ করিয়াছে।

ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস যিনি রচনা করিবেন তাঁহার দায়িত্ব অতি কঠিন। আর্য্য জাতির ভারতে আগমন হইতে আরম্ভ করিয়া

বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত বিভিন্ন ভাষায় যে বিভিন্ন সাহিত্য ভারতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা না করিলে তাহার কার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে না। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সেই আলোচনার স্থানাভাব। সংস্কৃত সাহিত্য, পারশী সাহিত্য এবং বর্ত্তমান ভারতের প্রাদেশিক সাহিত্যসমূহ যে সকল মহারথীর প্রতিভাস্পর্শে ধন্য হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে মাত্র তিনজনের সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করিয়াই আমরা ক্ষান্ত রহিলাম।

কালিদাস

কবিতা-নিকুঞ্জে তুমি, পিক-কুল-পতি!
.... শৈলেন্দ্র-সদনে,
লভি জন্ম মন্দাকিনী (আনন্দ জগতে!)
নাশেন কলুষ যথা এ তিন ভুবনে;
সঙ্গীত-তরঙ্গ তব উথলি ভারতে
(পুণ্য ভূমি!) হে কবীন্দ্র! সুধা বরিষণে
দেশ-দেশান্তরে কর্ণ তোষে সেই মতে।

—মাইকেল মধুসূদন

কালিদাস মহাকবি। তিনি ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় কবি। সংস্কৃত ভাষায় তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক, সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট খণ্ডকাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। সৌন্দর্য্য বর্ণনায় তাঁহার কৃতিত্ব অসাধারণ। তাঁহার সৌন্দর্য্যানুভূতি কত তীক্ষ্ণ এবং তীব্র, তাঁহার সৌন্দর্য্যসৃষ্টির

ক্ষমতা কত সুনিপুণ, তাহা তাঁহার কাব্যরস আস্বাদন করিলেই আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। প্রকৃতির সমুদয় মাধুর্য্য এবং মানব-হৃদয়ের সমুদয় রহস্য সম্মিলিত করিয়া কিরূপ অপরূপ সৌন্দর্য্যের উদ্ভব হয়, তাঁহার অনুপম সৌন্দর্য্যমণ্ডিত কাব্যগুলিই তাহার সমুজ্জ্বল উদাহরণ। শুধু তাহাই নহে। আমরা যেখানে সৌন্দর্য্যের আভাস পাই না, কালিদাস সেখানেও সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাইয়াছেন; বর্ণহীন বস্তুও তাঁহার কল্পনা এবং বর্ণনার গুণে নব নব রূপে রঞ্জিত হইয়াছে। এমনি করিয়া নিখিল বিশ্বের সকল কিছুকে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করিয়া দেখিতে আর কোন কবি পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ।

আজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় তাঁহার অতুলনীয় গ্রন্থাবলী অনূদিত হইতেছে, কিন্তু তিনি কোন্ সময়ে ভারতের কোন্ অংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহা আমরা আজও জানি না। ঐতিহাসিকগণ বহু তর্ক-বিতর্ক করিয়াও এ সম্বন্ধে কোন সর্ব্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—

হায়রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল,
পণ্ডিতেরা বিবাদ করে ল'য়ে তারিখ সাল।

আজকাল অনেক ঐতিহাসিক এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে কালিদাস খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে ও পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমভাগে জীবিত ছিলেন এবং গুপ্তবংশীয় সম্রাট্ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁহার পুত্র প্রথম কুমারগুপ্তের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। কিংবদন্তী আছে যে কালিদাস উজ্জয়িনীর অধিপতি বিক্রমাদিত্যের সভাকবি ছিলেন। বিক্রমাদিত্য কোনও রাজার নাম নহে, ইহা একটি উপাধিমাত্র। প্রাচীন ভারতের একাধিক রাজা এই উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। গুপ্তবংশীয় সম্রাট্ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তও বিক্রমাদিত্য নামে পরিচিত ছিলেন।

পাটলিপুত্র এবং উজ্জয়িনী তাঁহার রাজধানী ছিল; কোন কোন শিলালিপিতে তাঁহাকে "পাটলিপুরবরাধীশ্বর" এবং "উজ্জয়িনীপুর-বরাধীশ্বর" রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। কালিদাস নিজের কোন গ্রন্থে নিজের বা বিক্রমাদিত্যের পরিচয় লিপিবদ্ধ করেন নাই। যাঁহার কবিতার মাধুর্য্যে জগৎ মুগ্ধ, যাঁহার কাব্যরস আস্বাদন করিয়া সুদূর ইউরোপের পণ্ডিতমণ্ডলী বিস্মিত, ভারতবর্ষে যাঁহার নাম গৃহে গৃহে সমাদৃত ও পূজিত, তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনী সম্বন্ধে আমরা যে কিছুই জানি না ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার সৌন্দর্য্যমুগ্ধ অন্তর্জ্জগতের পরিচয় আমরা পাইয়াছি তাঁহার কাব্য হইতে। তাঁহার অমূল্য গ্রন্থাবলী আমাদের চির সহচর, চির-আনন্দ-দায়ক।

কালিদাস সম্বন্ধে অনেক উপাখ্যান বহুকাল ধরিয়া আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। সেগুলি উপাখ্যান মাত্র—প্রকৃত সত্য তাহার মধ্যে আছে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। তিনি নাকি ঘোর মূর্খ ছিলেন—একদিন তিনি বৃক্ষের যে শাখায় বসিয়াছিলেন সেই শাখাই কর্ত্তন করিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে মূর্খশ্রেষ্ঠ স্থির করিয়া কৌশলে তাঁহার সহিত উদ্ধতা প্রগল্‌ভা রাজকুমারীর পরিণয় সম্পন্ন করাইয়াছিলেন। কিন্তু স্ত্রী ভৎর্সনা করায় কালিদাস সংসার ত্যাগ করিলেন এবং কঠোর তপস্যার ফলে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর বর লাভ করিলেন। কবিবরের অসামান্য কবিত্ব সরস্বতীর প্রসাদে।

কালিদাসের রচনাবলী সম্বন্ধেও মতদ্বৈধ আছে। কালিদাসের গ্রন্থাবলী বলিয়া প্রকাশিত গ্রন্থে অনেক গ্রন্থের নাম উল্লিখিত আছে—যথা 'ঋতুসংহার', 'নলোদয়', 'পুষ্পবাণ বিলাস', 'শ্রুতবোধ', 'দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা', 'শৃঙ্গার-রসাষ্টক' প্রভৃতি। ইহার মধ্যে সকলগুলিই কবি কালিদাসের রচনা কি না সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। এই সকল

গ্রন্থের মধ্যে কোন কোনটির রচনার নিকৃষ্টতা দেখিয়াই সমালোচকগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কোন্ কোন্ কাব্য তাঁহার এবং কোন্‌গুলি তাঁহার নহে, এই সমস্যা এখনও চূড়ান্তভাবে মীমাংসিত হয় নাই।

'ঋতুসংহারে' গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শিশির, বসন্ত, এই ছয় ঋতুর সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। 'নলোদয়' কাব্যে চারিটী সর্গ। ইহাতে নল-দময়ন্তীর প্রসিদ্ধ উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। ইহা একটি খণ্ডকাব্য। 'পুষ্পবাণবিলাস' শৃঙ্গাররসপ্রধান একটি অতি ক্ষুদ্র কবিতা—ইহার শ্লোক সংখ্যা মাত্র ২৬। 'শ্রুতবোধ' অতি সুপরিচিত ছন্দোগ্রন্থ—এক একটি শ্লোকে এক একটি ছন্দের লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে; ইহার শ্লোক-সংখ্যা ৪১। 'দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা' গদ্য-পদ্যময় উপাখ্যান। 'শৃঙ্গারতিলক' শৃঙ্গাররসপ্রধান ক্ষুদ্র কবিতা—ইহাতে শ্লোক সংখ্যা ২৬। 'শৃঙ্গার-রসাষ্টকে' আটটী শ্লোকে শৃঙ্গার রস বর্ণিত হইয়াছে। যে মহাকবির সৃষ্ট অনবদ্য সৌন্দর্য্য যুগ যুগ ধরিয়া রসিকমণ্ডলীকে আনন্দ দান করিয়াছে, এইরূপ তরল লঘু রচনাবলী তাঁহারই লেখনীপ্রসূত বলিয়া স্বীকার করা কঠিন।

'কুমারসম্ভব' এবং 'রঘুবংশ' এই দুইখানি কালিদাসের অমর মহাকাব্য; 'মেঘদূত' তাঁহার সর্ব্বজনপ্রিয় খণ্ডকাব্য এবং 'মালবিকাগ্নি-মিত্র,' 'বিক্রমোর্ব্বশী,' 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' এই তিনখানি তাঁহার মহামূল্য নাটক। এই গ্রন্থগুলির রচয়িতা সম্বন্ধে কোনও মতদ্বৈধের অবকাশ নাই; কেবল 'কুমারসম্ভবে'র সপ্তদর্শ সর্গের মধ্যে প্রথম আটটি সর্গই কালিদাসের অমৃতময়ী লেখনী হইতে বিনির্গত;—অবশিষ্ট সর্গগুলি প্রক্ষিপ্ত—অন্য কবিযশঃপ্রার্থী সাধারণ কবি কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া সন্দেহ হয়। এই সর্গগুলিতে লিপিচাতুর্য্যের যে অক্ষমতা, প্রকাশ ভঙ্গীর যে

দুর্ব্বলতা এবং বিষয়ের যে অপ্রাসঙ্গিকতা দেখা যায় তাহা কালিদাসের লেখনীর উপযুক্ত নহে। কালিদাস অষ্টম সর্গ পর্য্যন্ত লিখিয়াই গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছিলেন অথবা তাঁহার রচিত অবশিষ্ট সর্গগুলি বিস্মৃতির গর্ভে লীন হইয়াছে—এ বিষয়ে মতের অনৈক্য আছে, তবে 'কুমার-সম্ভবের' শেষ নয় সর্গের রচয়িতা যে কালিদাস নহেন সে বিষয়ে প্রায় সকল সমালোচকই একমত।

'কুমারসম্ভব' 'রঘুবংশের' পূর্ব্বে বিরচিত। রচনাপ্রণালী, ঘটনা-বিন্যাস প্রভৃতি তাহার সাক্ষ্য। 'কুমারের' সুন্দর সৃষ্টি 'রঘুবংশে' সুন্দরতর; 'কুমারের' রচনাভঙ্গীর মধ্যে স্থানে স্থানে যে শিথিলতা লক্ষিত হয় 'রঘুবংশে' তাহা পূর্ণাবয়বপ্রাপ্ত। রতিবিলাপ ও অজবিলাপ, পার্ব্বতীর বিবাহ ও ইন্দুমতীর বিবাহ প্রভৃতি প্রসঙ্গের তুলনামূলক আলোচনা করিলেই ইহা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। 'কুমারসম্ভবে' কবি নবীন কল্পনার উল্লাসে স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল অঙ্কিত করিয়াছেন, স্বর্গের দেবতা হর-পার্ব্বতীর কথা বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু পরে 'রঘুবংশে' নিপুণতর প্রতিভার দ্বারা মর্ত্ত্যের চিত্র, ভারতের সর্ব্বপ্রধান নরপতিবৃন্দের চরিত্র-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। কালিদাসের নাটকাবলীর মধ্যেও এইরূপ প্রতিভার ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতি লক্ষিত হয়। প্রথমে 'বিক্রমোর্ব্বশী'—তাহাতে মর্ত্ত্য এবং মর্ত্ত্যের অতীত লোকের বিষয় সন্নিবিষ্ট আছে। পরে 'মালবিকাগ্নিমিত্র' ও 'অভিজ্ঞানশকুন্তল'—ইহাতে মর্ত্ত্যের বিষয়ই নিপুণতরভাবে বর্ণিত ও চিত্রিত। 'মালবিকাগ্নিমিত্রে'র নায়ক অগ্নিমিত্র আদর্শচরিত্রসম্পন্ন নহেন, কিন্তু কবির সর্ব্বশেষ গ্রন্থ 'শকুন্তলা'য় দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার চরিত্র অনিন্দ্য ও উজ্জ্বল। 'শকুন্তলা'র চরিত্রসৃষ্টি, বর্ণনারীতি প্রভৃতি অনেক বিষয়ই 'বিক্রমোর্ব্বশী' অপেক্ষা অধিকতর মনোরম। কালিদাস 'শকুন্তলা'য় যেরূপ নিপুণতার

সহিত চরিত্র-বিশ্লেষণ করিয়াছেন জগতের সাহিত্যে তাহার তুলনা বিরল।

'কুমারসম্ভবে'র কাহিনী এই ঃ—তারক নামে এক মহাবলশালী অতি দুর্দ্দান্ত অসুর ব্রহ্মার বরে মহাশক্তি লাভ করিয়া দেবতাদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করে এবং তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করে। দেবতারা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন। ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে এই কথা বলিয়া আশ্বাস প্রদান করেন যে পার্ব্বতীর গর্ভে শিবের যে পুত্র জন্মিবেন তিনি দেবতাদের সেনাপতি হইয়া তারকাসুরের প্রাণ সংহার করিয়া দেবতাদিগকে পুনরায় তাঁহাদের অধিকার প্রদান করিবেন। অতঃপর দেবতারা উদ্যোগী হইয়া হর-গৌরীর প্রণয় সম্পাদনের নিমিত্ত কন্দর্পকে নিযুক্ত করেন। কন্দর্প সমাধিস্থ বিরূপাক্ষের ধ্যানভঙ্গ করিতে উদ্যত হইলে শিবের রোষকষায়িত ললাট-নয়ননির্গত অগ্নিশিখা তাঁহাকে ভস্মীভূত করে। পরে হরগৌরীর পরিণয় হয় এবং কার্ত্তিকের জন্ম হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া কার্ত্তিক দেবসৈন্যের নায়করূপে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন এবং তারকাসুরের প্রাণসংহার করিয়া দেবতাদিগকে তাঁহাদের অধিকারে পুনরায় স্থাপিত করিলেন।

এই ঘটনা রামায়ণ, মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণে বর্ণিত আছে, কিন্তু কালিদাস কল্পনা-মাধুর্য্যে ও ভাষার লালিত্যে এই বহু-পরিচিত উপাখ্যানে নূতন প্রাণের সঞ্চার করিয়াছেন। কবির প্রতিভারশ্মিতে পুরাতন বহু-পরিচিত কাহিনী 'কুমারসম্ভবে' সরসসুন্দর নূতন সৃষ্টিতে পরিণত হইয়াছে। 'কুমারসম্ভব' কাব্যের নায়ক স্বয়ং শঙ্কর। হিমালয়ের মনোরম সানুদেশে গভীর তপস্যানিরত সমাধিমগ্ন শঙ্করের সম্মুখে সেবার্থিনী হিমালয়-দুহিতা গৌরী ইহার নায়িকা। ইন্দ্রের আদেশে মদন পিণাক-পাণির ধৈর্য্যচ্যুতি সাধনের জন্য বসন্তের সহিত

আশ্রমে সমাগত। যোগেশ্বরের যোগ-ভঙ্গই তাঁহার পণ। এই চিত্রটী 'কুমারসম্ভবে'র শ্রেষ্ঠ চিত্রের অন্যতম,—সংস্কৃত কাব্যের মধ্যে ভাষা ও ছন্দের মাধুর্য্যে এবং ভাবের মনোজ্ঞতায় এই চিত্রটী একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। মদন, রতি ও বসন্ত—তিনজন মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে আসিয়াছে—বহির্জ্জগতের বিচিত্র সৌন্দর্য্যসম্ভার সৃষ্টির ভার বসন্তের, আর অন্তর্জ্জগতে ইন্দ্রিয়বিক্ষোভ সৃষ্টি করিবার ভার মদন ও রতির। অকস্মাৎ সংযমী যতিশ্রেষ্ঠ শিব চিত্তবিকৃতির হেতু অনুসন্ধানে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া মদনকে অমোঘ বাণ সংযোজনে ব্যাপৃত দেখিলেন। তাঁহার ক্রোধের সঞ্চার হইল এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার নেত্রাগ্নি মদনকে ভস্মে পরিণত করিল। তখন—

ভরিয়া উঠে নিখিল ভব রতিবিলাপ সঙ্গীতে
সকল দিক কাঁদিয়া উঠে আপনি।

এইবার পার্ব্বতীর কঠোর তপস্যা! দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর পার্ব্বতী আশুতোষকে তুষ্ট করিবার জন্য দুঃসাধ্য সাধনায় নিমগ্ন রহিলেন। আশুতোষ তুষ্ট হইলেন, তথাপি নবীন ব্রহ্মচারীর ছদ্ম বেশে নবীনা তপস্বিনীকে তিনি প্রথমে পরীক্ষা করিতে আসিলেন। নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া অবশেষে ছদ্মবেশী ব্রহ্মচারী শিবের নিন্দা আরম্ভ করিলেন। পার্ব্বতী আরাধ্য দেবের নিন্দা সহ্য করিতে পারিলেন না, তীব্রভাবে উত্তরদান করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মচারী মহাদেবের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রস্থানোদ্যতা গৌরীকে ধারণ করিলেন, আর "শৈলাধিরাজতনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ"—হিমালয়-দুহিতা যাইতেও পারেন না, দাঁড়াইতেও পারেন না।

হিমালয়-সদনে হর-পার্ব্বতীর বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল।

হর-পার্ব্বতীর প্রীতির সীমা নাই—আশুতোষ প্রসন্নহৃদয়ে অনুমতি দিলেন যে কাম পুনর্জ্জীবন লাভ করিবে। কার্ত্তিকের জন্মের সূচনা হইল।

কালিদাস সম্ভবতঃ শৈব ছিলেন। 'রঘুবংশে'র প্রারম্ভে তিনি বলিয়াছেন—"জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী-পরমেশ্বরৌ"—জগতের পিতামাতা পার্ব্বতী ও পরমেশ্বরকে বন্দনা করি। তিনখানি নাটকের 'নান্দী'তে তিনি ইষ্টদেবতা আশুতোষকে বিভিন্ন চিত্রে বিভিন্ন ভাষায় বন্দনা করিয়াছেন,—সেই বন্দনা পবিত্র গম্ভীর মন্ত্রে উচ্চারিত, উপনিষদের ব্রহ্মস্বরূপ বর্ণনার স্নিগ্ধ বজ্রগম্ভীর ঘোষের মত উদাত্ত। সেই অভীষ্ট দেবতার সৌম্য মূর্ত্তি বর্ণনা করিয়া তিনি 'কুমারসম্ভব' কাব্যের পরিসমাপ্তি করিয়াছেন।

"সংস্কৃত ভাষায় যত মহাকাব্য আছে, তন্মধ্যে কালিদাস প্রণীত রঘুবংশ সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট............রঘুবংশে সূর্য্যবংশীয় নরপতিগণের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। এই মহাকাব্য ঊনবিংশতি সর্গে বিভক্ত। প্রথম আট সর্গে দিলীপ, রঘু, অজ এই তিন রাজার বর্ণনা আছে। নবম অবধি পঞ্চদশ পর্য্যন্ত সাত সর্গে দশরথের ও দশরথতনয় রামচন্দ্রের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। অবশিষ্ট চারি সর্গে কুশ অবধি অগ্নিবর্ণ পর্য্যন্ত রামের উত্তরাধিকারীদিগের বৃত্তান্ত সঙ্কলিত আছে।"

সৌন্দর্য্যসৃষ্টিই কবির প্রথম ও প্রধান গুণ সন্দেহ নাই। সেই সৃষ্টিনৈপুণ্যের কোনও লঘুতা ঘটিলে কাব্যের অপকর্ষ। সেইরূপ লোকশিক্ষা, সমাজশিক্ষা, আদর্শ চরিত্রসৃষ্টি প্রভৃতিও কবির প্রধান গুণ। কল্পনার উদ্দাম গতিই কাব্যের একমাত্র প্রাণ নহে। কালিদাসের শ্রেষ্ঠ কাব্য 'রঘুবংশে' এই সত্য বর্ণে বর্ণে উপলব্ধি করা যায়। দেবদ্বিজে ভক্তি, গুরুবাক্যে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, ভিক্ষার্থী অতিথির জন্য নৃপতির

অকাতরে সহধর্ম্মিনী বিসর্জ্জন প্রভৃতি মহান্ আদর্শসমূহ এই কাব্যে হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

সসাগরা ধরিত্রীর অধিপতি সূর্য্যবংশীয় মহারাজ দিলীপ পুত্রলাভের জন্য পত্নী সুদক্ষিণার সহিত মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে সাধারণ গোপালকের বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন। প্রকাণ্ড কেশরী নন্দিনী ধেনুকে আক্রমণে উদ্যত। দিলীপ ধেনুর পরিবর্ত্তে আত্মদানে কৃতসঙ্কল্প। ইহা রাজার পরার্থে আত্মোৎসর্গের পরীক্ষা। রাজা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, অপুত্রক নৃপতির পুত্রলাভ হইল। কুমারের নাম রঘু। কালক্রমে যুবরাজ রঘু অশেষগুণসম্পন্ন প্রচণ্ড পরাক্রমশালী বীর হইলেন। এইরূপ সর্ব্বতোভাবে সুযোগ্য যুবরাজকে রাজচ্ছত্র অর্পণ করিয়া মহারাজ দিলীপ বাণপ্রস্থ ব্রত অবলম্বন করিলেন।

সিংহাসন বিলাসের বস্তু নহে,—রাজার কঠোর কর্ত্তব্যের কেন্দ্রস্বরূপ। সুতরাং প্রজাবৃন্দের ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রঘু নিজেকে নিয়োজিত করিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই প্রজাদের পিতা ছিলেন, তাহাদের জন্মদাতা পিতা কেবল নামতঃ পিতা—"স পিতা পিতরস্তেষাং কেবলং জন্মহেতবঃ"। রঘুর রাজত্বে সকলেই শান্তিতে কাল যাপন করিত।

রাজধর্ম্ম অনুসারে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী মহারাজ রঘু দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন। নানাদেশ নানারাজ্য জয় করিয়া তিনি সগৌরবে অযোধ্যায় ফিরিলেন। এই দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে কালিদাসের বর্ণনাগুণে আমরা ভারতের মানচিত্র স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করি, ভারতভূমির প্রদেশসমূহের সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য্যের আভাস পাই, আর কবিকুলগুরু কালিদাসের কল্পনার উচ্ছ্বসিত গতি ও বর্ণনা-নৈপুণ্যের পরিচয় পাই।

কালক্রমে রাজর্ষি রঘু সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুত্ররত্ন লাভ করিলেন। পুত্রের

নাম হইল অজ। অজ পিতার ন্যায়ই ওজস্বী, বীর্য্যবান্, সমুন্নতকলেবর। বিদর্ভ রাজকুমারী ইন্দুমতীর স্বয়ংবর সভা—ভারতের রাজন্যবর্গ রাজোচিত বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া সমাসীন। রাজকুমারী অজকেই পতিত্বে বরণ করিলেন। এই প্রসঙ্গে আমরা ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নরপতির কীর্ত্তি-কাহিনী অবগত হই। মহারাজ অজ পরম আনন্দের সহিত আদর্শ রাজার ন্যায় রাজ্যশাসন ও অপত্যনির্বিবশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু দৈবযোগে দেবর্ষি নারদের বীণা-স্খলিত পুষ্পমাল্য ইন্দুমতীর দেহে পতিত হইল। ইহাতে তৎক্ষণাৎ রাণীর প্রাণবিয়োগ ঘটিল। অজের কি করুণ বিলাপ! ইন্দুমতী তাঁহার "গৃহিণী-সচিবঃ-সখী-মিথঃ-প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ"—গৃহিণী, মন্ত্রী, রহস্যে সখী, ললিতকলাবিষয়ে প্রিয়শিষ্যা। তিনি যুবরাজ দশরথের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া গঙ্গা এবং সরযূর পবিত্র সঙ্গমে প্রায়োপবেশনে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিলেন; সকল যাতনার অবসান হইল।

দশরথ, রামচন্দ্র প্রভৃতির চরিত্র কবিগুরু বাল্মিকী যেরূপ 'নিপুণতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন তাহার উপমা অন্যত্র নাই। কালিদাস সেই লোকোত্তর পুরুষগণের চরিত্র অতি সংক্ষেপে এমন উজ্জ্বল ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন যে তাহার মাধুর্য্যে আমরা মুগ্ধ হইয়া যাই। কালিদাসের বর্ণনার এমনই মোহিনী শক্তি! বাল্মীকির চির-সুন্দর কাব্য মন্থন করিয়া রসজ্ঞ ভাবুক পাঠকদের চিত্ত বিনোদনের জন্য কালিদাস রাম-সীতার চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন।

রাম ইহলোক পরিত্যাগের পূর্ব্বে কুশাবতী নগরে কুশকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। অযোধ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী নিশীথ-স্বপ্নে কুশের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট নিজের দুঃখ বর্ণনা করিলেন এবং তাঁহাকে অযোধ্যায় ফিরিতে অনুরোধ করিলেন। কুশাবতী ব্রাহ্মণদিগকে

দান করিয়া কুশ সদলবলে অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মহারাজ কুশ শৌর্য্য-বীর্য্যের অদ্বিতীয় আধার হইয়াও দুর্জ্জয় নামক দানবের সহিত যুদ্ধে স্বয়ং নিহত হইলেন। কুমার অতিথি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। যশস্বী অতিথি পুত্র নিষধের হস্তে রাজ্যভার দান করিয়া যথাসময়ে স্বর্গধামে গমন করিলেন। মহারাজ নিষধের পর আরও কয়েকজন নৃপতি অযোধ্যার রাজসিংহাসনে ক্রমে ক্রমে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। শেষ নৃপতি অগ্নিবর্ণ আসন্নপ্রসবা মহিষীকে অকূল শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই পর্য্যন্ত বিবরণ দিয়া কালিদাস 'রঘুবংশে'র শেষ করিয়াছেন।

কালিদাসের খণ্ডকাব্যগুলির মধ্যে 'মেঘদূত' বিশেষ সুপরিচিত। "সংস্কৃত ভাষায় যত খণ্ডকাব্য আছে, মেঘদূত তন্মধ্যে সর্ব্বাংশে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মেঘদূত ক্ষুদ্র কাব্য বটে, কিন্তু ইহার প্রায় প্রত্যেক শ্লোকেই অদ্বিতীয় কবি কালিদাসের অলৌকিক কবিত্ব শক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়।"

কুবেরের ভৃত্য এক যক্ষ অত্যন্ত স্ত্রৈণতাবশতঃ কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করায় কুবের তাহাকে এই শাপ দেন যে তাহাকে একাকী এক বৎসর রামগিরিতে অবস্থিতি করিতে হইবে। আটমাস নির্ব্বাসন দণ্ড ভোগ করিয়া প্রিয়তমার বিরহে যক্ষ অধীর হইয়া উঠে। আষাঢ়ের প্রথম দিবসে নভোমণ্ডলে নূতন মেঘের উদয় দেখিয়া সে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইল। তাহার মনে হইল মেঘ সচেতন প্রাণী, তাই সে প্রিয়ার নিকট সংবাদ পাঠাইবার জন্য মেঘকে দৌত্যভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। হয়ত মেঘ যক্ষপুরীর পথ চিনিতে পারিবে 'না, তাই সে রামগিরি হইতে অলকা পর্য্যন্ত পথের বর্ণনা করিল। এই বর্ণনাপ্রসঙ্গে কালিদাস প্রাচীন ভারতের এক অপূর্ব্ব ভৌগোলিক চিত্র আমাদের

সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। নানা গিরি, নদী, গ্রাম, নগর, উপবন, দেবালয়, রাজধানী, হিমালয়, কৈলাস, অলকা—একটির পর একটি চিত্র যেন জীবন্তভাবে আমাদের মানসনেত্রে ভাসিয়া উঠে। তাহার পরে বিরহিণী যক্ষপত্নীর বর্ণনা! "ঐ সমস্ত বর্ণনায় এমন অসাধারণ কবিত্ব শক্তি ও অনন্যসামান্য সহৃদয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে যে যদি কালিদাস মেঘদূত ব্যতিরিক্ত অন্য কোনও কাব্য রচনা না করিতেন, তথাপি তাঁহাকে ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় কবি বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইত।"

'মেঘদূত' দুই খণ্ডে বিভক্ত—পূর্ব্বমেঘ ও উত্তরমেঘ। পূর্ব্বমেঘে মেঘকে দৌত্যে বরণ এবং তাহার পথ-নির্দ্দেশ উল্লিখিত হইয়াছে; উত্তর মেঘে অলকাপুরীতে যক্ষের আলয়, যক্ষ পত্নীর সৌন্দর্য্য প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। এই কাব্যের প্রত্যেক শ্লোকই মন্দাক্রান্তা নামক সুমধুর ছন্দে গ্রথিত। ভাষা ও ভাবের উৎকর্ষে প্রত্যেক শ্লোকই পরম মনোরম ও রমণীয়। অনেক বাঙ্গালী কবি কবিতায় ইহার অনুবাদ করিয়াছেন, কিন্তু কালিদাসের কবিত্বের মাধুর্য্য কে অনুকরণ করিতে পারে?

এইবার আমরা কালিদাসের নাটকাবলীর আলোচনা করিব। 'মালবিকাগ্নিমিত্র' পার্থিব ঘটনায় পূর্ণ, 'বিক্রমোর্ব্বশীতে' পার্থিব এবং অপার্থিব ঘটনার বর্ণনা, আর 'অভিজ্ঞানশকুন্তলে' পার্থিব ও অপার্থিব ঘটনার সহিত কবি-কল্পনার অপূর্ব্ব সম্মিলন। 'মালবিকাগ্নিমিত্র' একখানি ঐতিহাসিক নাটক। অগ্নিমিত্র একজন ঐতিহাসিক নৃপতি। তাঁহার পিতা পুষ্যমিত্র শুঙ্গ মগধের সম্রাট্ ছিলেন। পিতার জীবিত-কালে অগ্নিমিত্র বিদিশা নগরীতে বাস করিয়া রাজপ্রতিনিধিরূপে মধ্যভারত শাসন করিতেন। তাঁহার সহিত বিদর্ভরাজকুমারী মালবিকার প্রেমের কাহিনী অবলম্বন করিয়াই কালিদাস এই নাটকখানি রচনা

করিয়াছেন। ঘটনাচক্রে মালবিকা দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃতা হন এবং নানারূপ ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর অগ্নিমিত্রের প্রধানা মহিষী ধারিণীর আশ্রয় লাভ করেন। একদিন অকস্মাৎ অগ্নিমিত্র চিত্রে মালবিকার সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হন। পরে রাজবয়স্য বিদূষকের কৌশলে মালবিকার সহিত তাঁহার মিলন হয়। এই সংবাদ জানিতে পারিয়া ধারিণী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং মালবিকাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। বিদূষক আবার নানা কৌশলে রাজার সহিত তাহাকে সম্মিলিত করিলেন। পরে রাণী ধারিণীর ক্রোধের উপশম হইল; তিনি স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া অগ্নিমিত্রের সহিত মালবিকার বিবাহের বন্দোবস্ত করিলেন। বিবাহ-সভায় মালবিকার বংশ পরিচয় দৈবচক্রে প্রকাশিত হইল। বিদিশার রাজ-অন্তঃপুরে আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল।

মালবিকা রাজার কন্যা, কিন্তু ভাগ্যবশে রাজবধূ না হইয়া তিনি অগ্নিমিত্রের প্রধানা মহিষীর পরিচারিকা হইযাছিলেন। তবু কোনও সময়ে কোনও অবস্থায় তিনি কোনও প্রকার অধীরতার পরিচয় দেন নাই। কবি মালবিকা-চরিত্র অতি মনোজ্ঞভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। মালবিকার ভাগ্যবিপর্য্যয় মহাকবির নূতন সৃষ্টি। অগ্নিমিত্রকে তিনি প্রতিভাবান্ নৃপতিরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্যকরী শক্তি ও চিত্তের দৃঢ়তা অপরিসীম। তাঁহার অন্তঃকরণ স্নেহময়, অথচ তিনি কঠোর কর্ত্তব্যপরায়ণ। তাঁহার চরিত্র হইতে আমরা সেই যুগের আদর্শ নৃপতির রাজ্যশাসন সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করিতে পারি। স্নেহদাক্ষিণ্যময়ী ধর্ম্মপরায়ণা প্রবীণা গৃহিণী ধারিণীর চরিত্রও অতি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। চরিত্রসৃষ্টিতে কালিদাস ছিলেন অপরাজেয় শিল্পী।

'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটক পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত। ইহাতে পুরূরবা ও উর্ব্বশীর বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। ইহা শকুন্তলার মত অত মনোরম

নহে। ইহা কালিদাসের প্রথম নাটক বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে 'মালবিকাগ্নিমিত্র'ই কালিদাসের প্রথম নাটক। যে বৃত্তান্ত অবলম্বনে এই গ্রন্থ প্রণীত তাহার উল্লেখ বিভিন্ন পুরাণে এবং বেদে পর্য্যন্তও পাওয়া যায়।

পরম পরাক্রমশালী নৃপতি পুরূরবা রথে আরোহণ করিয়া আকাশ-পথে বিচরণ করিতে করিতে দেখিলেন, কেশী অসুর পরমাসুন্দরী অপ্সরা উর্ব্বশীকে অপহরণ করিতেছে। রাজা কেশীকে নিহত করিয়া সুন্দরীকে উদ্ধার করিলেন। উর্ব্বশী কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে মহারাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; তাঁহার অন্তঃকরণে অনুরাগের সঞ্চার হইল। তারপর উর্ব্বশী দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু পুরূরবার চিন্তা তাঁহার মন হইতে বিদূরিত হইল না। একদিন অমরাবতীর রঙ্গমঞ্চে লক্ষ্মীর ভূমিকায় অবতীর্ণা উর্ব্বশী পুরূরবার চিন্তায় আত্মহারা হইয়া "পুরুষোত্তমের উপর" এই কথা বলিতে "পুরূরবার উপর" বলিলেন। নাট্যশাস্ত্রপ্রণেতা মহর্ষি ভরত তাঁহাকে অভিসম্পাত করিলেন, "তুমি মানুষী হও"। উর্ব্বশী মর্ত্ত্যে আসিলেন। রাজা পুরূরবা অমাত্যগণের উপর বিশাল সাম্রাজ্যের ভার অর্পণ করিয়া কৈলাস পর্ব্বতের শিখরে গন্ধমাদন বনে প্রস্থান করিলেন,—উর্ব্বশীর জন্য প্রজাপালন বিস্মৃত হইলেন। কিন্তু বেশীদিন সুখভোগ তাঁহার ভাগ্যে ছিল না। দৈবচক্রে উর্ব্বশী অচেতন লতারূপে রূপান্তরিত হইলেন। দীর্ঘকাল পরে এক মণির স্পর্শে উর্ব্বশীর উদ্ধার হইল। তিনি পুরূরবার সহিত পুনরায় মিলিত হইলেন।

পুরূরবার প্রেমোন্মত্ততা নাটকটীতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়। ধীরে ধীরে তাঁহার হৃদয় উর্ব্বশীময় হইয়া গিয়াছিল। তিনি রাজার কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া উর্ব্বশীর জন্য বনবাস বরণ করিয়াছিলেন।

উর্ব্বশীকে হারাইয়া তিনি উন্মাদের ন্যায় বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। কবির অবারিত কল্পনা এই শোকবিহ্বল প্রেমিকের উদ্ভ্রান্ত চিত্ত বর্ণনায় শতমুখী হইয়া প্রবাহিত হইয়াছে।

'অভিজ্ঞানশকুন্তল' কালিদাসের সর্ব্বপ্রধান নাটক। সংস্কৃত ভাষার সমস্ত নাটকের মধ্যে ইহা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট। মহাভারতের এক ক্ষুদ্র উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া কালিদাস এই অপূর্ব্ব নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন। এই নাটকখানি শুধু ভারতবর্ষে নয়, সুদূর ইউরোপেও অসাধারণ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। মহামতি গেটে বলিয়াছেন—

Wouldst thou the earth and heaven itself,
In one sole name combine ?
I name thee, O Sakuntala, and
All at once is said.

[তুমি যদি স্বর্গ ও মর্ত্ত্য একত্র দেখিতে চাও তবে শকুন্তলায় তাহা পাইবে।] গেটের এই শ্লোকটি দীপবর্ত্তিকার শিখার ন্যায় ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহা দীপশিখার মতই সমগ্র নাটকটিকে এক মুহূর্ত্তে উদ্ভাসিত করিয়া দেখাইবার উপায়।

এই মনোহর নাটক সাত অঙ্কে বিভক্ত। "প্রথম অঙ্কে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার সাক্ষাৎকার, দ্বিতীয়ে রাজার বিদূষকের সহিত শকুন্তলা-বিষয়ক কথোপকথন ও কণ্বাশ্রমবাসী ঋষিগণকর্ত্তৃক রাজার নিকটে কতিপয় রাত্রি আশ্রমে আতিথ্য স্বীকার প্রার্থনা, তৃতীয়ে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার মিলন, চতুর্থে শকুন্তলার পতিগৃহে প্রস্থান, পঞ্চমে শকুন্তলার দুষ্মন্তসমীপে গমন ও প্রত্যাখ্যান, ষষ্ঠে রাজার বিরহ, এবং সপ্তমে শকুন্তলার সহিত পুনর্মিলন।" বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রণীত 'শকুন্তলা' গ্রন্থ

সর্ব্বজনপরিচিত। তাহা এই নাটকের অনুকরণে রচিত, সুতরাং বাঙ্গালী পাঠকমাত্রেই 'অভিজ্ঞানশকুন্তলে'র মনোহর আখ্যানভাগের সহিত পরিচিত। কিন্তু কবির কল্পনা, বর্ণনার মাধুর্য্য, চরিত্র অঙ্কনের সৌন্দর্য্য, মানবমনের অন্তর্নিহিত রহস্যবিশ্লেষণের অনন্যসাধারণ শক্তি প্রভৃতি গুণাবলীর আস্বাদ মূলের সহিত পরিচয় না থাকিলে পাওয়া যায় না। অনসূয়া-প্রিয়ংবদা সখীদ্বয় কি সুন্দরভাবে অঙ্কিত হইয়াছেন! শকুন্তলার সহিত মালবিকা বা উর্ব্বশীর তুলনাই হয় না। প্রকৃতিপালিতা, তপোবনের প্রশান্ত আবেষ্টনীতে লালিতা, সরলা শকুন্তলা যেন প্রকৃতিরই কন্যা; মানবসমাজের কোনও কৃত্রিমতা তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার চিত্র কোমল স্বাভাবিকতার উজ্জ্বল আলেখ্য। রাজসভায় মুগ্ধহৃদয়া সারল্যময়ী প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলার করুণ চিত্র কত মর্ম্মস্পর্শী! তিনি প্রগল্‌ভার ন্যায় বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন নাই—আন্তরিকতার সহিত মর্ম্মের আক্ষেপবাণী প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র। আর দুষ্যন্তের চরিত্র কত শুভ্র ও নিষ্কলঙ্ক! তিনি আদর্শ রাজা, আদর্শ প্রেমিক। কালিদাস দেখিলেন, মহাভারতের দুষ্যন্ত-চরিত্রে দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়বিক্ষোভ; মনের উপর আধিপত্য তাঁহার নাই, ইন্দ্রিয়ের নিকট তাঁহার স্বকীয় তেজ নিষ্প্রভ। তাই কবি মহাভারতের উপাখ্যানে যাহা নাই সেই দুর্ব্বাসার শাপের সৃষ্টি করিয়া দুষ্যন্ত-চরিত্রের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া তাঁহাকে মহান্ ও উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। এই চিত্র অনন্যসাধারণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।

'অভিজ্ঞানশকুন্তল' সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার চরম নিদর্শন। ইহা কবির কাব্যসৃষ্টির পরম উৎকর্ষ। রসজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ বলেন, "কালিদাসস্য সর্ব্বস্বম্ অভিজ্ঞানশকুন্তলম্"—এই নাটক কবির সর্ব্বস্ব; প্রেম ও ধর্ম্মের পবিত্র মহামিলনে মহামহিমমণ্ডিত। যে কোনও চরিত্রে আমরা

আলোচনা করি, যে কোনও বর্ণনা আমরা প্রণিধান করি, যে কোনও নিসর্গচিত্র আমরা পর্য্যবেক্ষণ করি, তাহাতেই আমরা বিস্মিত, মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইয়া যাই। কবির সৌন্দর্য্যসৃষ্টি এখানে এত সূক্ষ্ম ও বিরাট! কবি এই গ্রন্থে বলিয়াছেন—"আপরিতোষাৎ বিদুষাং ন সাধু মান্য প্রয়োগবিজ্ঞানম্"—বিদ্বন্মণ্ডলী পরিতুষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত গ্রন্থের উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচার করা চলে না। কবির এই আশঙ্কা অমূলক। তিনি যে কবিত্ব ও রচনাপারিপাট্য প্রদর্শন করিয়াছেন, পাঠকের এবং দর্শকের হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যেরূপ সহৃদয়তার সহিত এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে সমস্ত দেশের সমস্ত যুগের বিদ্বন্মণ্ডলী সত্যই মুগ্ধ হইয়াছেন। ইহা কাব্যরূপে যেরূপ সমাদৃত, দৃশ্যকাব্যরূপেও সেইরূপ প্রশংসিত। "দুষ্মন্ত প্রকৃত পুরুষ বলিয়াই পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করিলেন। মহাকবি তাঁহার বিশাল চিত্রপটে এই আশ্চর্য্য পরিণতি আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। সে চিত্রের বিস্তার পৃথিবী হইতে স্বর্গ পর্য্যন্ত। সে চিত্রে গ্রীক নাটকের আকারগত সৌন্দর্য্য, জার্ম্মাণ নাটকের প্রণালীগত আধ্যাত্মিকতা এবং ইংরাজী নাটকের কার্য্যগত জীবন্তভাব পূর্ণমাত্রায় লক্ষিত হয়। সেই সৌন্দর্য্যপূর্ণ ভাবগম্ভীর গূঢ় রহস্যব্যঞ্জক মহাপটের নাম 'অভিজ্ঞানশকুন্তল'।"

সংক্ষিপ্ত আলোচনা দ্বারা কালিদাসের কাব্যের গভীরতা ও মাধুর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না। হিমালয়ের মত তাঁহার কাব্য অনন্তরত্ন-প্রভব—"বর্ণিলে জীবনকাল না ফুরাবে তবু"।

সংস্কৃতে একটী কথা আছে, "উপমা কালিদাসস্য"। কালিদাসের কাব্যের প্রধান গুণ মনোরম উপমা প্রয়োগ এবং বিভিন্ন অলঙ্কারের সুষ্ঠু ব্যবহার। কালিদাসের ভাষার সঙ্গীতধর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে ছন্দে এবং শব্দালঙ্কারে। সমুদ্রের বেলাভূমি বর্ণনা করিতে যাইয়া তিনি

বলিয়াছেন—"তমালতালীবনরাজিনীলা আভাতি বেলা"—সমুদ্রের বেলাভূমি তমালতালীবনরাজি দ্বারা নীল এবং দেদীপ্যমান। এই কয়টি কথা শব্দালঙ্কারের ঝঙ্কারে চিরপ্রসিদ্ধ। 'কুমারসম্ভবে'র নায়িকা উমা "সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব"—সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার ন্যায়। "হরস্তু কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্য্যশ্চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ"—চন্দ্রোদয়ের আরম্ভে জলরাশির ন্যায় মহাদেব কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্য্য হইলেন। যোগীশ্বরের যোগমগ্ন প্রশান্তচিত্তের চাঞ্চল্যকে ইহা অপেক্ষা আর সুন্দররূপে বর্ণনা করা যায় না। স্বয়ংবর সভায় ইন্দুমতী "সঞ্চারিণী দীপশিখেব রাত্রৌ"—রাত্রিতে সঞ্চারিণী দীপ-শিখার মত। আর কোনও সংস্কৃত কবির কাব্যে উপমার চমৎকারিত্ব এত মনোহরভাবে পরিস্ফুট হয় নাই। কালিদাসের উপমাগুলির মধ্যে যেমন অর্থের চমৎকারিত্ব তেমনি ইহাদের মধ্যে অনেক ব্যঞ্জনা, অনেক সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন থাকে—সেই ব্যঞ্জনার অস্ফুট আভাস স্পষ্ট অর্থকে আরও গভীরতা, আরও রহস্য দান করে। এই প্রসঙ্গেই লক্ষণীয় দেশকালপাত্রের সমস্ত অবস্থানের সহিত উপমাটির সার্থক অন্বয়। উপমা কত বিচিত্র, কত বিরাট, কত মৌলিক, কত পবিত্র হইতে পারে তাহা কালিদাসের ন্যায় আর কোন্ কবি প্রদর্শন করিয়াছেন?

আমীর খসরু

"আলাউদ্দীন খল্‌জীর রাজত্বকালে যে সকল কবি বর্ত্তমান ছিলেন তাঁহাদের ন্যায় কবি উক্ত সুল্‌তানের রাজত্বকালের পুর্ব্বে অথবা পরে আর কখনও আবির্ভূত হন নাই। রচনার প্রাচুর্য্যে এবং ভাবের মৌলিকতায় আমীর খস্‌রু অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়। অন্যান্য সাহিত্যিকগণের মধ্যে কেহ গদ্যে এবং কেহ পদ্যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু আমীর খস্‌রু সাহিত্যের প্রত্যেক বিভাগেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ। বিভিন্ন শ্রেণীর পদ্য রচনায় তাঁহার ন্যায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে সমর্থ কোন কবি পূর্ব্বে কখনও আবির্ভূত হন নাই এবং সম্ভবতঃ শেষ বিচারের দিন পর্য্যন্ত আর আবির্ভূত হইবেন না।"

—জিয়াউদ্দীন বরণী প্রণীত 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী'

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে সিন্ধুদেশ আরবজাতীয় মুসলমান-গণের পদানত হয়। সেকালে মুসলমান সভ্যতা বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল এবং নানাদেশে প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু সিন্ধুদেশের অধিপতি হইয়াও মুসলমানগণ ভারতবর্ষে তাঁহাদের রাজনৈতিক প্রভুত্ব ও সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। প্রতাপশালী রাজপুত রাজগণ তখন ভারতের উত্তর ও পশ্চিম প্রান্তে হিন্দুসভ্যতার দ্বাররক্ষক-রূপে বর্ত্তমান ছিলেন।

একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গজনীর অধিপতি মহাবীর সুল্‌তান মাহ্‌মূদ বার বার ভারতবর্ষ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া রাজপুত রাজগণের ক্ষমতা খর্ব্ব করেন। সমগ্র ভারতে মুসলমান অধিকার স্থাপন করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না; কেবলমাত্র পঞ্জাব স্বরাজ্যভুক্ত করিয়াই তিনি

সন্তুষ্ট রহিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধরগণ প্রায় দেড়শত বৎসর পঞ্জাবে রাজত্ব করেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে আফ্‌গানিস্থান, পারস্য এবং মধ্য এশিয়া হইতে বহু মুসলমান ভারতবর্ষে আগমন করিয়া পঞ্জাবে স্থায়ী বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। এইরূপে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ক্রমশঃ যোগসূত্র স্থাপিত হয় এবং ভারতবর্ষে মুসলমান সভ্যতার বিকাশ আরম্ভ হয়। পঞ্জাবের মুসলমান রাজগণ সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পারসী গীতিকবিতা এবং উর্দ্দু গজল শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতবাসী মুসলমানগণ পারসী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সকল গ্রন্থের অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়াছে, সুতরাং তাহাদের সাহিত্যিক মূল্য কতখানি ছিল তাহা নির্দ্ধারণের উপায় নাই।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ঘূর রাজ্যের সেনাপতি মুইজ্‌উদ্দীন মুহম্মদ উত্তর ভারতে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করেন। দিল্লী মুসলমান সাম্রাজ্যের রাজধানী হইল। হিন্দুকুশ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া বহু ভাগ্যান্বেষী মুসলমান ভারতবর্ষে আসিতে লাগিলেন। পঞ্জাব হইতে পূর্ব্ববঙ্গ পর্য্যন্ত মুসলমান সভ্যতা প্রচারিত হইতে লাগিল। মুসলমান রাজগণের উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় পারসী ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত হইল। সেকালের মুসলমান গ্রন্থকারগণের মধ্যে অমর কবি আমীর খস্‌রু শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। তাঁহার প্রতিভার জ্যোতিঃ পরবর্ত্তী কবিগণের প্রতিভা ম্লান করিয়া দিয়াছিল। সমসাময়িক কবিদের মধ্যে ইনি যেন সহস্র রশ্মিতে দীপ্তি পাইতেন।

আমীর খস্‌রু তুর্কিজাতীয় ছিলেন। তাঁহারা পিতা আমীর সৈফ্‌উদ্দীন মাহ্‌মূদ ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সম্ভবতঃ বল্‌খ্‌ দেশ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং দিল্লীর সুলতান ইল্‌তুৎমিসের

অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করেন। ভারতবর্ষে স্থায়িভাবে বাস করিবার সঙ্কল্প করিয়া তিনি বর্ত্তমান আগ্রা-অযোধ্যা সংযুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত ইটাবা জেলায় পটিয়ালী গ্রামে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। সম্ভবতঃ ১২৫৩ খৃষ্টাব্দে এই গ্রামে আমীর খস্রু জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং তিনি ভারতীয় ছিলেন।

আমীর সৈফ্‌উদ্দীন স্বয়ং নিরক্ষর হইলেও পুত্রের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে অকালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তখন কিশোর আমীর খস্রু তাঁহার মাতামহের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন। এই মাতামহ দিল্লীর সুল্‌তান ঘিয়াস্‌উদ্দীন বল্‌বনের দরবারে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার সাহায্যে আমীর খস্রু অল্প বয়সেই বল্‌বনের সভায় স্থান লাভ করেন। এইরূপে তাঁহার উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়।

সুল্‌তান বল্‌বন সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; আমীর খস্রুর সুমধুর কবিতাবলী শীঘ্রই তাঁহাকে মুগ্ধ করিল। ফলে তরুণ কবি সুল্‌তানের কনিষ্ঠ পুত্র বুঘ্‌রা খাঁর পার্শ্বচর নিযুক্ত হইলেন। কিছুদিন পরে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা তুঘ্রিল খাঁ বিদ্রোহী হইলে বল্‌বন তাঁহাকে দমন করিবার জন্য সসৈন্যে বঙ্গদেশে আগমন করিলেন। বুঘ্‌রা খাঁ এবং আমীর খস্রু তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন। বিদ্রোহ দমনের পর বল্‌বন বুঘ্‌রা খাঁকে বাঙ্গালার শাসনভার অর্পণ করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আত্মীয়-স্বজন ফেলিয়া এই দূরদেশে বাস করা আমীর খস্রুর ভাল লাগিল না; জলপ্লাবিত বাঙ্গালা দেশ তাঁহার বিরক্তি উৎপাদন করিল। তাই সুল্‌তানের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও দিল্লীতে ফিরিয়া গেলেন; বুঘ্‌রা খাঁর সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ হইল।

দিল্লীতে যাইয়া আমীর খস্রু বল্‌বনের জ্যেষ্ঠ পুত্র মুহম্মদ খাঁর পার্শ্বচর হইলেন। মুহম্মদ খাঁ তখন মূলতান প্রদেশের শাসনকর্ত্তা

ছিলেন। আমীর খস্রু তাঁহার সহিত তিন বৎসর মূলতানে বাস করিলেন। মুহম্মদ খাঁও পিতার ন্যায় সাহিত্যরসিক ও কাব্যরসপিপাসু ছিলেন। তিনি পারস্যের মহাকবি সাদীকে ভারতবর্ষে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সাদীর দেহ তখন জরাজীর্ণ, মৃত্যুর প্রাক্কালে বড় সাধের সিরাজনগর পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেশে আসিতে তিনি স্বীকৃত হইলেন না। মুহম্মদ খাঁর নিমন্ত্রণের উত্তরে তিনি স্বরচিত কয়েকটি কবিতা স্বহস্তে নকল করিয়া তাঁহাকে উপহার স্বরূপ প্রেরণ করিলেন। আমীর খস্রুর কবিত্বের যশ সুদূর পারস্যেও পৌঁছিয়াছিল। সাদী মুহম্মদ খাঁর নিকট লিখিত পত্রে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিলেন।

বল্বনের রাজত্বকালে চিঙ্গীজ খাঁর বংশধরগণের শাসনাধীন দুর্দ্দান্ত মুঘলগণ বারংবার পঞ্জাব আক্রমণ করিয়াছিল। তাহারা তখনও ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই ; নানা দেব-দেবী এবং ভূত-প্রেত তাহাদের উপাস্য ছিল। এজন্য মুসলমানগণ তাহাদিগকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিত, তাহারাও মুসলমানদিগকে নির্ম্মূল করিতে চেষ্টা করিত। বল্বন স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্রের উপর সীমান্ত রক্ষার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। মুহম্মদ খাঁও বহু যুদ্ধে মুঘলদিগকে পরাজিত করিয়া বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এক খণ্ড যুদ্ধে মুঘলেরা তাঁহাকে হত্যা করিল। এই শোকাবহ ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া আমীর খস্রু একটি মর্ম্মস্পর্শী কবিতা রচনা করেন। মুঘলেরা কবিকেও বন্দী করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কৌশলে মুক্তিলাভ করেন।

প্রিয় পুত্র মুহম্মদের শোকে বল্বন অল্পদিনের মধ্যেই পরলোকগমন করিলেন ; দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন বুঘ্রা খাঁর পুত্র কায়কোবাদ। তিনি নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ও বিলাসী ছিলেন। মুহম্মদের শত্রুরাই তাঁহার দরবারে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, সুতরাং মুহম্মদের

প্রিয় সহচর আমীর খস্রুর স্থান সেখানে ছিল না। এই সময়ে অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা ছিলেন হাতিম খাঁ। দানশীলতার জন্য তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। দুই বৎসর হাতিম খাঁর আশ্রয়ে বাস করিয়া আমীর খস্রু দিল্লীতে ফিরিয়া আসিলেন। এবার সুল্‌তান কায়কোবাদ তাঁহাকে সাদরে সভাসদ্‌রূপে গ্রহণ করিলেন। কায়কোবাদের রাজত্বকালের ইতিহাস বর্ণনা করিয়া আমীর খস্রু একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই অকর্ম্মণ্য ও রুগ্ন কায়কোবাদকে হত্যা করিয়া তাঁহার সেনাপতি জলালউদ্দীন খল্‌জী সিংহাসন অধিকার করিলেন। নূতন সুল্‌তানের সহিত আমীর খস্রু পূর্ব্ব হইতেই বিশেষ পরিচিত ছিলেন। জলালউদ্দীন কবিকে পরম সমাদরে প্রধান পারিষদরূপে নিযুক্ত করিলেন। সুল্‌তান স্বয়ং কবি এবং সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক ছিলেন। তাঁহার সভায় বহু কবি ও গায়ক সমবেত হইয়াছিলেন। আমীর খস্রু তাঁহার চিত্তবিনোদনের জন্য বহু উৎকৃষ্ট 'গজল' রচনা করিলেন। এতদ্ভিন্ন সুল্‌তানের অভিযানসমূহ বর্ণনা করিয়া একখানি ঐতিহাসিক কাব্য রচিত হইল।

মাত্র ছয় বৎসর রাজত্ব করিয়াই জলালউদ্দীন প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা আলাউদ্দীনের চক্রান্তে নিহত হন। আলাউদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আমীর খস্রুকে পূর্ব্বপদে বহাল রাখিলেন। আলাউদ্দীন স্বয়ং নিরক্ষর ছিলেন, জলালউদ্দীনের ন্যায় কবি-প্রতিভা তাঁহার ছিল না; কিন্তু সেজন্য তিনি যে সে যুগের সাহিত্যিকগণের প্রতি সহানুভূতিহীন ছিলেন তাহা নহে। তবে সম্ভবতঃ তিনি আমীর খস্রুর প্রতি যথোচিত সমাদর প্রদর্শন করেন নাই। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বরণী দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, "আমরী খস্রুর ন্যায় কবি সুল্‌তান মাহ্‌মুদের রাজত্বকালে আবির্ভূত হইলে তিনি তাঁহাকে বিস্তৃত জায়গীর প্রদান করিতেন অথবা

প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিতেন ; কিন্তু আলাউদ্দীন এরূপ কবিকে যথোচিত সমাদর না করিয়া মাত্র সহস্র তঙ্কা দিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন।" তথাপি আমীর খস্রু মুক্তকণ্ঠে আলাউদ্দীনের গুণগান করিয়াছেন। বরণীও একথা স্বীকার করিয়াছেন যে শিল্পে ও সাহিত্যে আলাউদ্দীনের রাজত্বকাল বাগ্দাদ, কায়রো এবং কন্‌ষ্ট্যান্টিনোপ্‌লের সমকক্ষ ছিল। তাঁহারই রাজত্বকালে আমীর খস্রুর কাব্য পরম রমণীয়তা ধারণ করিয়াছিল। ভাব-গভীরতায়, ভাষা-মাধুর্য্যে ও ছন্দ-ঝঙ্কারে এই সময়ে রচিত আমীর খস্রুর কবিতাগুলি পরম উপাদেয়। এতদিনে উপযুক্ত নায়কের সন্ধান পাইয়া তাঁহার প্রতিভা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া উঠিল। আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে তিনি বহু সরস সুন্দর কবিতা এবং একখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মুবারক খল্‌জী দিল্লীর সুল্‌তান হইলেন। আমীর খস্রু পূর্ব্ববর্ত্তী সুল্‌তানগণের ন্যায় তাঁহারও অনুগ্রহ লাভ করিলেন। সম্ভবতঃ আলাউদ্দীন অপেক্ষা মুবারক কবির প্রতি অধিকতর বদান্যতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আমীর খস্রু সুল্‌তান মুবারকের কীর্ত্তি বর্ণনা করিয়া একখানি ঐতিহাসিক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

মুবারক অকালে নিহত হইলে ঘিয়াস্‌উদ্দীন তুঘ্‌লুক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। আমীর খস্রু তাঁহার অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হইলেন না। ঘিয়াস্‌উদ্দীনের রাজত্বকালের ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি একখানি কাব্য রচনা করিলেন। সুল্‌তান বিদ্রোহ দমনের জন্য বঙ্গদেশে আগমন করিলে কবিও তাঁহার অনুবর্ত্তী হন। দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার অল্পদিন পরেই আমীর খস্রুর মৃত্যু হয়।

সেকালের বিখ্যাত ফকীর নিজামউদ্দীন আউলীয়া আমীর খস্রুর

ধর্ম্মজীবনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। ১২৩৮ খৃষ্টাব্দে আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের অন্তর্গত বদাউন সহরে তাঁহার জন্ম হয়; ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁহার পিতামহ বোখারা হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। নিজামউদ্দীন অল্প বয়সেই পাণ্ডিত্য এবং ধর্ম্মানুরাগের জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। সাংসারিক ঐশ্বর্য্য বা রাজনৈতিক প্রভাবের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র আসক্তি ছিল না। সুল্‌তান আলাউদ্দীন খল্‌জী একবার শাসন-সংক্রান্ত কয়েকটি প্রস্তাব সম্বন্ধে তাঁহার মতামত চাহিয়াছিলেন। ফকীর উত্তর দিলেন, "রাজকার্য্য সম্বন্ধে দরবেশের কোন বক্তব্য নাই।" সুল্‌তান এই উত্তরে বিশেষ প্রীত হইয়া ফকীরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার বাড়ীতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। নিজামউদ্দীন একথা শুনিয়া বলিলেন, "এই ক্ষুদ্র ব্যক্তির গৃহে দুইটি দরজা আছে। যদি সুল্‌তান এক দরজা দিয়া ঘরে প্রবেশ করেন তবে আমি অপর দরজা দিয়া বাহির হইয়া যাইব।" সুল্‌তান অতঃপর আর কখনও তাঁহাকে বিরক্ত করেন নাই। দিল্লীতে এখনও নিজামউদ্দীনের সমাধি বর্ত্তমান আছে।

নিজামউদ্দীন কিছুদিন আমীর খস্‌রুর মাতামহের বাড়ীতে বাস করিয়াছিলেন। আমীর খস্‌রু মাত্র আট বৎসর বয়সে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে নিজামউদ্দীন তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে কাব্য রচনায় উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে ফকীরের প্রভাবে কবির মনে ধর্ম্মপিপাসা জাগিয়াছিল। আমীর খস্‌রু প্রায়ই নিজামউদ্দীনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। তিনি বহু কবিতায় ফকীরের প্রশংসা করিয়াছেন; কোন কোন কবিতায় সুল্‌তানের নামের পূর্ব্বেই ফকীরের নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

আমীর খস্রুর কাব্য গ্রন্থাবলী নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। তিনি বহু ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল কবিতায় তাঁহার অনন্যসাধারণ কৌতুকপ্রিয়তা এবং পারসী ভাষার উপর তাঁহার অসাধারণ অধিকার পরিস্ফুট হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার কবিত্ব শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ এই সকল খণ্ড কবিতায় হয় নাই। 'মস্নবী', 'কাসিদা' এবং 'গজল' নামক তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত যে সকল কবিতা তিনি রচনা করিয়াছেন তাহাই তাঁহার প্রতিভার পরিচায়ক। তাঁহার অধিকাংশ 'মস্নবী' ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত, কিন্তু নীরস বিষয়বস্তুও তাঁহার অলৌকিক প্রতিভার স্পর্শে সরসতা লাভ করিয়াছে। অলঙ্কারের বাহুল্য এবং ছন্দের রীতি কবি আমীর খস্রুর কল্পনার উদ্দাম গতিকে প্রতিহত করিতে পারে নাই।

তাঁহার রচিত 'মস্নবী'গুলির মধ্যে দেবলারাণী ও খিজির খাঁর প্রেম সংক্রান্ত পুস্তকটিই কাব্যাংশে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। দেবলারাণী গুজরাটের বাঘেলা বংশীয় রাজপুত রাজা দ্বিতীয় কর্ণের কন্যা ছিলেন। আলাউদ্দীন খল্জী গুজরাট জয় করিলে কর্ণ দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করেন। তাঁহার পত্নী কমলা এবং কন্যা দেবলা দিল্লীতে যাইতে বাধ্য হন। আলাউদ্দীন স্বয়ং কমলাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন, দেবলার সহিত আলাউদ্দীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র খিজির খাঁর বিবাহ হয়। আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রিয় সেনাপতি মালিক কাফুর খিজির খাঁর চক্ষু উৎপাটন করিয়া তাঁহাকে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করিয়া রাখেন। বন্দী অবস্থায় খিজির্ খাঁর সঙ্গিনী ছিলেন দেবলা। কিছুদিন পরে সুল্তান মুবারক খল্জীর আদেশে খিজির খাঁকে হত্যা করা হয়। এই করুণ কাহিনী আমীর খস্রুর বর্ণনায় এমন জীবন্ত মর্ম্মস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে যে কোন পাঠকই ইহা পাঠ করিয়া অশ্রুসংবরণ করিতে পারেন না।

অন্য কোন 'মস্‌নবী' এত হৃদয়গ্রাহী হয় নাই, কারণ সুল্‌তানগণের গুণগান করিয়া তাঁহাদের প্রীতিভোজন হইবার উদ্দেশ্যেই কবি সেগুলি রচনা করিয়াছিলেন।

পারস্য দেশের সুপ্রসিদ্ধ কবি নিজামীর অনুকরণে আমীর খস্‌রু 'মস্‌নবী'গুলি রচনা করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, "উচ্চাভিলাষ পরিপূর্ণ হৃদয়ে আমি নিজামীর মোহিনী শক্তির অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম; আমার আশা ছিল যে আমিও তাঁহার ছন্দের অনুসরণ করিয়া পাঠকের মন মুগ্ধ করিতে পারিব। এখন আমি আমার অক্ষমতার পরিচয় পাইয়া নিজামীর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতেছি।" কাব্যাংশে আমীর খস্‌রুর 'মস্‌নবী'গুলি নিজামীর রচনার ন্যায় মধুর না হইলেও সেগুলি ইতিহাসের উপকরণ হিসাবে বিশেষ মূল্যবান্। কায়কোবাদ, জলালউদ্দীন, আলাউদ্দীন, মুবারক এবং ঘিয়াস্‌উদ্দীন তুঘ্‌লুকের শাসনকালের ইতিহাস রচনা করিতে হইলে আমীর খস্‌রুর গ্রন্থাবলীর উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতে হইবে। প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্য কবি সময় সময় অতিরঞ্জন এবং সত্যগোপন করিয়াছেন বটে, কিন্তু সমসাময়িক বিবরণ হিসাবে তাঁহার রচনাবলীর বিশেষ মূল্য আছে।

আমীর খস্‌রু গদ্যেও বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু গদ্য রচনায় তিনি তেমন কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। কাব্যই তাঁহার পক্ষে ভাবপ্রকাশের স্বাভাবিক বাহন ছিল। তাঁহার গদ্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'খজাইন-উল-ফুতুহ্‌' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই গ্রন্থে আলাউদ্দীনের দাক্ষিণাত্য বিজয়ের ইতিহাস বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

আমীর খস্‌রু তাঁহার একখানি গ্রন্থে সেকালের হিন্দুদের ধর্ম্ম, সামাজিক অবস্থা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা

কবি-চিত্তের উদারতার পরিচায়ক। তাঁহার জন্মভূমি ভারতবর্ষ খোরাসান হইতে সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট ও উন্নত, ইহা তিনি গর্ব্বের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে হিন্দুরা দর্শনশাস্ত্রের সকল শাখায় অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল; বিভিন্ন দেশ হইতে শিক্ষার্থীরা ভারতবর্ষে আগমন করিত, কিন্তু হিন্দুরা বিদ্যাচর্চ্চায় এত উন্নতি লাভ করিয়াছিল যে তাহাদের কখনও জ্ঞানলাভের জন্য বিদেশে যাইতে হইত না। হিন্দু ধর্ম্মের সহিত ইস্‌লাম ধর্ম্মের কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য আছে, ইহা আমীর খস্‌রু লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে উভয় ধর্ম্মই ঈশ্বরের অসীমত্বে আস্থাবান্। হিন্দুদের মূর্ত্তিপূজার আধ্যাত্মিক মর্ম্মও তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে হিন্দুদের মতে দেব-দেবীর মূর্ত্তি ঈশ্বরের বিভিন্ন বিভূতির প্রতীক মাত্র। সেকালে হিন্দু ও মুসলমানের সংস্কৃতি যে ধীরে ধীরে মিলনের পথে অগ্রসর হইতেছিল, আমীর খস্‌রুর রচনাবলীতে আমরা তাহার পরিচয় পাই।

রবীন্দ্রনাথ

জগৎ কবি-সভায় মোরা তোমার করি গর্ব্ব ;
বাঙ্গালী আজি গানের রাজা বাঙ্গালী নহে খর্ব্ব !

এ কথা রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিগণের সহিত রবীন্দ্রনাথ একাসনে বসিবার উপযুক্ত। তাঁহার মত বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন কবি জগতের সাহিত্যে বিরল। এমন একজন কবি বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আজ বাঙ্গালাদেশ ও বাঙ্গালী জগতের কাছে গৌরবান্বিত।

কলিকাতার বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। ইঁহার জন্ম হয় ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ। ঠাকুর পরিবার জ্ঞানে, বিদ্যায়, অর্থে ও চরিত্রের গুণে সবিশেষ প্রসিদ্ধ। ধর্ম্মে ও কর্ম্মে, ত্যাগে ও ভোগে. কলায় ও বিদ্যায় ঠাকুর পরিবারের শিক্ষা আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ ছিল ; কোন স্কুল-কলেজের অপেক্ষা রাখে নাই। এই পরিবারে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বাল্য ও কৈশোরের শিক্ষা পাইয়াছিলেন।

বিদ্যালয়ের জীবন রবীন্দ্রনাথের কাছে দুঃসহ ছিল। সেখানকার প্রাচীরের কারা তাঁহার কল্পনাপ্রবণ কবিমানসকে পীড়িত করিত। সেইজন্য তিনি স্কুল-কলেজে লেখাপড়া শিখেন নাই। কিন্তু শিক্ষার প্রতি উদাসীন তিনি কোনদিনই ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ নিজের শিক্ষার দায়িত্ব নিজের হাতেই লইয়া বাড়ীতে বসিয়া অতি অল্প বয়সেই



রবীন্দ্রনাথ

রাশি রাশি ইংরেজী ও বাঙ্গালা গ্রন্থ পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, মুখে মুখে কবিতা আবৃত্তি, কাব্য ও সাহিত্যের সমালোচনা প্রভৃতি তাঁহাদের বাড়ীতে প্রায়ই হইত। এইরূপ একটা সাহিত্যিক পরিবেষ্টনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী জীবনে নানা উপায়ে নানা দিক হইতে তাঁহার জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হইয়াছিল। এখনও তাঁহার জ্ঞানানুশীলন কিছুমাত্র কমে নাই। বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ না করিলেও তাঁহার মত বহুবিদ্য ব্যক্তি জগতের যে কোনও দেশে বিরল। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষালাভের বিশিষ্টতাও লক্ষ্যণীয়। তিনি জ্ঞান আহরণ করিয়াই ক্ষান্ত নহেন। তিনি তাঁহার অধীত বিদ্যাকে রসায়িত করিয়া কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে, গল্পে ও প্রবন্ধে পরিবেশন করিয়াছেন। তাঁহার সকল রচনাতেই মার্জ্জিত বুদ্ধির যে দীপ্তি এবং বিদ্যার যে সৌরভ লক্ষিত হয় তাহা অতুলনীয়।

অতি অল্প বয়সেই রবীন্দ্রনাথের কবিত্বশক্তির উন্মেষ হইয়াছিল। মাত্র আট-নয় বৎসর বয়স হইতেই কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করিয়া তিনি তাঁহার ভবিষ্যৎ কবি-জীবনের পরিচয় দান করেন। কবির বয়স যখন ১৪ বৎসর (১২৮২ সাল) তখন 'জ্ঞানাঙ্কুর' নামক একখানি সাময়িক পত্রিকায় 'বনফুল' নামে তাঁহার প্রথম কাব্য-উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ইহার পরে ১২৮৪ সালে কবির জ্যেষ্ঠ সহোদর সুপ্রসিদ্ধ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'ভারতী' নামক বিখ্যাত পত্রিকাখানি প্রকাশ করেন। 'ভারতী'তে প্রথম বৎসর হইতেই রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ, কবিতা, উপন্যাস, সমালোচনা, সঙ্কলন প্রভৃতি প্রকাশিত হইতে থাকে। প্রথম বৎসরের 'ভারতী' কবির বহু রচনায় সমৃদ্ধ হইয়াছিল— কবির বয়স তখন মাত্র ১৬ বৎসর। এই বয়সেই তিনি কবিকাহিনী,

ভগ্নহৃদয় ও ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী নামক কাব্যগুলি রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং এই সময় হইতেই তাঁহার কবি-প্রতিভার উন্মেষ ও প্রকাশারম্ভ বলা যাইতে পারে। এই সময় হইতেই তাঁহার প্রতিভা-নির্ঝরিণী শতমুখে শতদিকে যাত্রা করিয়া চলিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা নব নব উন্মেষশালিনী। কবিতা, গান, নাটক, গল্প, উপন্যাস, প্রহসন, প্রবন্ধ, সমালোচনা, যেদিকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রতিভাজ্যোতি বিকীর্ণ করিয়াছেন, সেই দিকটিই সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। কবিতাকে এখনও তিনি নব নব রূপ দান করিতে করিতে চলিয়াছেন—তিনি নিজের সৃষ্টিকে নিজেই অতিক্রম করিয়া নূতন রূপ-সৃষ্টি করিতে এখনও বিরত হন নাই। কবি নব নব ছন্দ আবিষ্কার করিয়াছেন—তাঁহার বাগ্‌বৈভবে ও প্রকাশভঙ্গিমায় বাঙ্গালা সাহিত্য সুসমৃদ্ধ হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক প্রতিভা বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যকে কি করিয়া সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়া জগতের যে-কোনও দেশের সাহিত্যের সমতুল্য করিয়াছে তাহা বুঝিতে হইলে রবীন্দ্র-পূর্ব্ব বাঙ্গালা সাহিত্যের ধারাটুকু বুঝিতে হইবে।

বাঙ্গালা সাহিত্যের আধুনিক যুগ আরম্ভ হয় খৃষ্টীয় উনবিংশ শতকে। ঐ যুগে বাঙ্গালী ইউরোপীয় সাহিত্যের ভাবধারার সহিত পরিচিত হইয়াছিল—তখন ইউরোপীয় সভ্যতা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি বাঙ্গালীকে এমন মুগ্ধ করিয়াছিল যে বাঙ্গালী আপনার জাতীয় ভাব এবং চিন্তাকে বিসর্জ্জন দিবার উপক্রম করিয়াছিল। দাশু রায়ের পাঁচালী এবং ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' প্রভৃতি খাঁটি বাঙ্গালী-প্রতিভাপ্রসূত কাব্য। কিন্তু শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজকে তাহা পরিতৃপ্ত করিতে পারিতেছিল না। বাঙ্গালী তখন শেক্‌স্‌পীয়ার, মিল্‌টন, গেটে, দান্তে, হোমার প্রভৃতি

ইউরোপীয় কবির কাব্যের সৌন্দর্য্যে এমন আকৃষ্ট হইয়াছে যে তাহার কবল হইতে মুক্ত হইয়া আপনার জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিবার মত অবস্থা তাহার আর ছিল না। বাঙ্গালী জাতির এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের এম্‌নি দুর্দ্দিনে বাঙ্গালা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র এবং মধুসূদনের্ আবির্ভাব।

বঙ্কিমচন্দ্র এবং মধুসূদন উভয়েই ইউরোপীয় সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন—ইঁহারা ইউরোপীয় সাহিত্যের ভাণ্ডার হইতে আহৃত ভাবধারা বাঙ্গালা গদ্য ও কাব্য-সাহিত্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করাইয়া দিয়া বাঙ্গালাভাষাকে এমন অভিসিঞ্চিত করিলেন যে তাহাতে বাঙ্গালী জনসাধারণ বিস্মিত হইল। তখন সকলেরই বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধা হইল, বাঙ্গালা ভাষার প্রকাশক্ষমতা এবং সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে সকলের আস্থা জন্মিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যে এবং মধুসূদনের মহাকাব্যে ইউরোপীয় এবং ভারতীয় ভাব ও কল্পনার অপূর্ব্ব সমন্বয় হওয়ায় বাঙ্গালা সাহিত্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সূচিত হইয়াছিল। বঙ্কিম-মধুসূদনের সাহিত্যসৃষ্টির আদর্শ পরবর্ত্তী কবি ও গদ্য-রচয়িতাদের পথপ্রদর্শক হইয়াছে। সাহিত্য-সৃষ্টিতে তাঁহাদের সফলতা বহু লেখকের প্রেরণা জোগাইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র এবং মধুসূদনের সমসাময়িক কালেই বাঙ্গালা সাহিত্যে আর একজন কবি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইঁহার কাব্যেও পাশ্চাত্য কাব্যসাহিত্যের রসস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। ইনি কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী। বিহারীলালও মধুসূদন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মতই ইউরোপীয় কাব্যসাহিত্য হইতে অনুপ্রেরণা পাইয়া কাব্যসৃষ্টি করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন এবং বিহারীলালকে পাইবার সৌভাগ্য বাঙ্গালার হইয়াছিল বলিয়াই বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্য বিলয়প্রাপ্ত না হইয়া

আজ শতপত্রবিস্তারে দিগন্ত প্রসারিত হইয়াছে এবং বিশ্বসাহিত্যে আপনার বিশিষ্ট স্থানটি অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

বিহারীলালই কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাধনার পথপ্রদর্শক। রবীন্দ্রনাথ গীতিকবি—বিহারীলালের গীতিকাব্যসুধা রবীন্দ্রনাথকে যতখানি আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করিয়াছিল, বঙ্কিমের গদ্য-কাব্য অথবা মধুসূদনের মহাকাব্য তাঁহাকে তেমন প্রভাবান্বিত করে নাই। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি কবিগণ বঙ্গসাহিত্যে আবির্ভূত হইয়া মাইকেল মধুসূদনের অনুকরণে মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ঐ মহাকাব্য রচনার যুগে আবির্ভূত হইয়া বিহারীলাল রচনা করিলেন গীতিকাব্য। রবীন্দ্রনাথের মনে গীতিকাব্যের প্রতি একটা স্বাভাবিক আসক্তি ছিল বলিয়া তিনি কবি বিহারীলালকেই তাঁহার কবি-গুরু বলিয়া গ্রহণ করিয়া গীতিকাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। গীতিকবি বিভিন্ন অনুভূতিকে রূপদান করেন, আর মহাকবি কোনও পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক বীরত্বকাহিনী অবলম্বন করিয়া কাব্যরচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ গীতিকবি, তাই তিনি জীবনের বিভিন্ন অনুভূতি বিভিন্ন ছন্দে ও সুরে প্রকাশ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ কেন মহাকাব্য রচনার চেষ্টা করেন নাই সে সম্বন্ধে নিজেই বলিয়াছেন—

আমি নাব্‌ব মহাকাব্য
সংরচনে
ছিল মনে,—
ঠেকল কখন তোমার কাঁকন
কিঙ্কিনীতে
কল্পনাটি গেল ফাটি
হাজার গীতে।

মহাকাব্য সেই অভাব্য
দুর্ঘটনায়
পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে
কণায় কণায়!

রবীন্দ্রনাথ একথাও নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে কবি বিহারীলালের গীতিকাব্যসুধা পান করিয়া তাঁহার কবি-প্রতিভা শৈশবে পরিপুষ্ট হইয়াছিল।

'সন্ধ্যাসঙ্গীত' নামক কাব্য রবীন্দ্রনাথের কুড়ি বৎসর বয়সের রচনা। এই সময় পর্য্যন্ত বিহারীলালের ভাষা, ছন্দ এবং কল্পনা রবীন্দ্রনাথের আদর্শস্বরূপ ছিল। তখন পর্য্যন্ত তিনি বিহারীলালেরই ভাব, ভাষা ও ছন্দের অনুকরণে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং কাব্যসৃষ্টির মন্ত্রে রবীন্দ্রনাথ দীক্ষিত হন বিহারীলালের কাছ হইতে। তাহার পর কবির 'প্রভাত সঙ্গীত' নামক কাব্য প্রকাশিত হয় ১২৯০ সালে —অর্থাৎ কবির বাইশ বৎসর বয়সে। এই কাব্যে কবি আপন প্রতিভা সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছেন। 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' একটা বিষাদের সুর আছে। বিশ্বপ্রকৃতির সহিত কবির তখনও নিবিড় ও পরিপূর্ণ পরিচয় লাভ হয় নাই। বিশ্বপ্রকৃতির সহিত যোগের জন্য 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' কবির বিষাদ —প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি না করিতে পারায় কবির প্রাণ এই কাব্যে কাঁদিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু 'প্রভাত সঙ্গীতে' বিশ্বপ্রকৃতির সহিত কবির পরিচয় ঘটিয়াছে। এই কাব্যে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত কবির মিলনের আনন্দ প্রকাশ পাইয়াছে। প্রভাত সঙ্গীতের বহু কবিতায় দেখি যে কবির কুঞ্চিত হৃদয় প্রকৃতির প্রসারতা ও স্নিগ্ধতা লাভ করিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। কবি তাঁহার প্রতিভারও পরিচয় পাইলেন

এই কাব্যে—'প্রভাত সঙ্গীতে' কবির প্রতিভা যেন অকস্মাৎ উৎসারিত হইয়াছে। তাই কবি গাহিয়াছেন—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি' ;
জগৎ আসি' সেথা করিছে কোলাকুলি।

অকস্মাৎ অসীম বিশ্বপ্রকৃতির আভাস অনুভব করিয়া কবির উল্লাস এখানে প্রকাশিত হইয়াছে।

'প্রভাতসঙ্গীত' রচনার পর হইতে রবীন্দ্রনাথ আজ পর্য্যন্ত যত কাব্য রচনা করিয়াছেন সে সকলের মধ্যে কবির কল্পনা স্বাভাবিক ভাবেই আপন পথ করিয়া লইয়া দিকে দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল, মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি, কথা, কাহিনী, কল্পনা, কণিকা, ক্ষণিকা, নৈবেদ্য. শিশু, উৎসর্গ, খেয়া, গীতাঞ্জলি, বলাকা, পূরবী, মহুয়া, বনবাণী, পুনশ্চ, পরিশেষ প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। কবির এক এক সময়কার রচিত কতকগুলি করিয়া কবিতা একত্র করিয়া ঐ সকল কাব্যের এক একটি গ্রথিত হইয়াছে। প্রত্যেক কাব্যে কবি রবীন্দ্রনাথের কল্পনা ও চিন্তাধারার একটি বিশিষ্টতা লক্ষিত হয়। সংক্ষেপে রবীন্দ্রকাব্যের কয়েকখানির ভাব ও কল্পনা এখানে বিশ্লেষিত হইল।

'কড়ি ও কোমলে' রবীন্দ্রনাথের রচিত বহু সনেট বা চতুর্দ্দশপদী কবিতা আছে। রবীন্দ্রনাথের সনেটের মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন বলিয়া গিয়াছেন—

হে রবীন্দ্র, তোমার ও-সুন্দর সনেট
কী সরস!

'কড়ি ও কোমলে' প্রকৃতি তাহার রূপ-রস-বর্ণ-স্পর্শ-গন্ধ লইয়া এবং

মানুষ তাহার বুদ্ধি-মন-স্নেহ-প্রেম লইয়া কবিকে মুগ্ধ করিয়াছে। সেইজন্য কবি নিজেই বলিয়াছেন—

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

কবির কাছে বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বমানব দুইই সমান প্রিয়! শিশু সম্বন্ধে কবিতা রচনার যে কৃতিত্ব কবি পরজীবনে প্রকাশ করিয়াছেন তাহার বীজ দেখিতে পাওয়া যায় 'কড়ি ও কোমল' কাব্যে। কবির স্বদেশ-প্রেমের উন্মেষও এই কাব্যে। এই হিসাবে কাব্যখানি রবীন্দ্র-সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

'কড়ি ও কোমলে'র পর রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' কাব্যখানি প্রকাশিত হয়। 'মানসী'তে কবির প্রকাশ-সামর্থ্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই কাব্যে কবির প্রতিভা আত্ম-প্রতিষ্ঠ হইয়াছে, কবির চিন্তাশক্তি সুপরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং ইহাতে তিনি দেশের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে নিপুণতা ও মমতার সহিত আলোচনা করিয়াছেন। অন্যান্য নানা বিষয় সম্বন্ধে কবিতাও ইহাতে আছে। 'মানসী'র অপর বিশিষ্টতা ইহার ছন্দোবৈচিত্র্য। কবি এই কাব্যে নানা ধরণের নব নব ছন্দ সৃষ্টি করিয়াছেন।

'মানসী'র পরে 'সোনার তরী'। রবীন্দ্রকাব্য-সাহিত্যে 'সোনার তরী' একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই কাব্যের প্রথম কবিতা সোনার তরী—সেই অনুসারেই কাব্যের নামকরণ হইয়াছে। এই কাব্যের প্রায় প্রত্যেকটি কবিতার মধ্যে কবির সৌন্দর্য্যানুভূতি সুন্দর ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার কবিতাগুলি কল্পনায়, কবিত্বে, ভাষার ঐশ্বর্য্যে ও ছন্দোবৈচিত্র্যে অপূর্ব্ব। 'সোনার তরী'র পরে কবি 'চিত্রা', 'চৈতালি' কাব্য রচনা করিয়াছেন। এই সকল কাব্যে কবির

প্রতিভা ক্রমশঃ পূর্ণবিকাশ লাভ করিয়াছে। 'চৈতালি'র পর 'কথা' এবং 'কাহিনী' নামক কাব্য দুই খানি প্রকাশিত হয়। এই দুইখানি কাব্যের প্রায় সকল আখ্যায়িকাই ত্যাগের কাহিনী। বৌদ্ধ, শিখ, মহারাষ্ট্র ও রাজপুত জীবনের এবং বাঙ্গালার সামাজিক জীবনের ত্যাগের কাহিনী অবলম্বন করিয়া এই কাব্যের প্রায় সকল কবিতা রচিত হইয়াছে। এইজন্য 'কথা' ও 'কাহিনী'র প্রত্যেকটি কবিতার মধ্য দিয়া এক একটি মহৎ আদর্শ অথবা আত্ম-ত্যাগের উজ্জ্বল আদর্শ প্রকাশ পাইয়াছে।

'কথা' ও 'কাহিনী' রচনার কয়েক বৎসর পরেই রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা' কাব্যখানি প্রকাশিত হয়। 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' কবি তাঁহার প্রতিভার সন্ধান পাইয়াছিলেন। কিন্তু 'ক্ষণিকা' কাব্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাব নিজস্ব ভাষার সন্ধান পাইয়াছেন এবং ছন্দের উপর তাঁহার অধিকার কায়েমী হইয়াছে। গীতিকবিতার উপাদান—ছন্দ, সহজ ভাষা ও অলঙ্কার। এ সবই এই ক্ষণিকা কাব্যের প্রত্যেকটি কবিতার মধ্যে নানাভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। ভাষার মধুরতায়, ছন্দঝঙ্কারে ও অলঙ্কারের মাধুর্য্যে 'ক্ষণিকা'র প্রত্যেকটি কবিতাই কবির অনবদ্য অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

'ক্ষণিকা'র পরেই 'নৈবেদ্য'। 'নৈবেদ্য' কবির এক অভিনব সৃষ্টি। ইহাতে রবীন্দ্রনাথ সাধক কবি। 'নৈবেদ্যে'র প্রায় সকল কবিতাতেই আধ্যাত্মিক ভাব বর্ত্তমান। এই কাব্যে সাধক রবীন্দ্রনাথ ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছেন পূর্ণ মনুষ্যত্ব—নিজের জন্য ও স্বদেশবাসীর জন্য। সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে ও ধর্ম্মের পথে চলিতে গেলে অশেষ দুঃখ হয়ত আমাদিগকে পাইতে হইবে—কবি ইহা জানেন। অথচ সেই সত্য, ন্যায় ও ধর্ম্মের প্রতি কবির আসক্তি। সেইজন্য তিনি দুঃখ বরণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া দুঃখ বহন করিবার শক্তি প্রার্থনা করিয়াছেন পরমেশ্বরের নিকট।

রবীন্দ্রনাথের শিশু সম্বন্ধীয় কবিতা রচনার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় 'কড়ি ও কোমল' কাব্যে। কিন্তু রবীন্দ্র প্রতিভার এই দিকটি চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে 'শিশু' কাব্যে। 'শিশু'র অনেকগুলি কবিতাই কল্পনা প্রবণ শিশুহৃদয়ের সুখদুঃখের স্মৃতিতে পরিপূর্ণ। কবি শিশুচিত্তের অন্তর্নিহিত রহস্য সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে সরসসুন্দর করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন এই কাব্যে। শিশুর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া এরূপ চমৎকার কাব্য জগতে অতি অল্প কবিই রচনা করিয়াছেন।

পৃথিবীতে এক শ্রেণীর কাব্য আছে যাহা কোনও বিশেষ দেশের বা কালের নহে। সেই সকল কবিতা সার্ব্বজনীন—স্থান কালকে অতিক্রম করিয়া সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালে তাহাদের সমাদর। রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' এই শ্রেণীর কাব্য। এই কাব্যের সার্ব্বজনীনতা (universalism) উপলব্ধি করিয়া পাশ্চাত্য জগৎ মুগ্ধ হইয়া রবীন্দ্রনাথকে নোবেল প্রাইজ দান করিয়াছিল। এই 'গীতাঞ্জলি' পুস্তকের দ্বারাই সমগ্র ইউরোপে রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতি বিস্তৃত হইয়া পড়ে। 'গীতাঞ্জলির' কবিতাগুলির মধ্যে একদিকে আছে কবির আধ্যাত্মিক সাধনার বিকাশ, অপরদিকে আছে দেশের দুর্দ্দশায় বেদনাবোধ।

'গীতাঞ্জলি'র পরে 'বলাকা'।

নানাদিক হইতে এই 'বলাকা' কাব্য রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্যসমূহের অন্যতম। ইহার ছন্দের মধ্যে নূতনত্ব আছে, ইহার ভাবও অভিনব। রবীন্দ্রনাথ একমাত্র 'বলাকা' কাব্য রচনা করিলেও বঙ্গসাহিত্যে একটি স্থায়ী আসন লাভ করিতেন ইহা নিঃসন্দেহ।

রবীন্দ্রনাথের প্রায় সকল কাব্যের মধ্যেই আমরা একটা গতিবেগ দেখিতে পাই। কবি ক্রমাগত যাত্রা করিয়া চলিতে চাহিয়া উদাত্ত কণ্ঠে গাহিয়াছেন—

যাত্রী আমি ওরে,
পার্‌বে না কেউ রাখ্‌তে আমায় ধ'রে।

'বলাকা'র প্রত্যেক কবিতায় এই গতির কথাটি খুব সুস্পষ্ট। ইহার প্রত্যেকটি কবিতা 'অকারণ অবারণ চলার' আহ্বানে ভরপূর। কবি আকৈশোর অনুভব করিয়াছেন যে স্থিতিতে বস্তুর স্তূপ জমিয়া উঠে, আর গতিতে বস্তুর রূপ ফুটিয়া উঠে। গতির মধ্য দিয়াই বিশ্বের প্রাণশক্তি বিকাশ পায়। সেইজন্য কবি ক্রমাগত অসীমের দিকে যাত্রা করিয়া চলিয়াছেন এবং তিনি তাঁহার দেশবাসীদিগকেও ক্রমাগত যাত্রা করিয়া চলিবার আহ্বান জানাইয়াছেন। কবি জানেন যে গতি স্থগিত হইলেই আবিলতা আবর্জ্জনা জমিবে ও মৃত্যু উপস্থিত হইবে। সেইজন্য তিনি বলিয়াছেন—

আমরা চলি সমুখ পানে
কে আমাদের বাঁধ্‌বে?
রৈল যারা পিছুর টানে
কাঁদ্‌বে তারা কাঁদ্‌বে।

পরিবর্ত্তনের গতির দ্বারা মন নবীন হয়। যৌবন বিকশিত হইয়া উঠে—কবি ইহা উপলব্ধি করিয়া গাহিয়াছেন—

পুণ্য হই সে চলার স্নানে,
চলার অমৃতপানে
নবীন যৌবন
বিকশিয়া ওঠে প্রতিক্ষণ।

গতিশীলতার এই বর্ণনা ছন্দলালিত্যে ও শব্দৈশ্বর্য্যে বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্যে এক অপূর্ব্ব সম্পদের সৃষ্টি করিয়াছে।

'পূরবী' ও 'মহুয়া' কাব্য দুইখানি রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের

রচনা। কিন্তু এই দুইখানি কাব্যের সকল কবিতাতেই তারুণ্যের রঙ্ ধরিয়াছে—প্রত্যেক কবিতার মধ্য দিয়া চিরতরুণ কবিমানসটি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তরুণ বয়সে রচিত 'সোনার তরী' প্রভৃতি কাব্যে কবির যে উদ্দাম কল্পনা ও বর্ণনাভঙ্গী বর্ত্তমান ছিল, পরিণত বয়সের রচনা এই 'পূরবী' ও 'মহুয়া' কাব্যের মধ্যে সেইরূপ ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যাই।

'বনবাণী'তে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত নিবিড়তম পরিচয়ের কথা আছে।

'পুনশ্চ', 'পরিশেষ' প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের আধুনিক রচনা। 'পুনশ্চ' গ্রন্থখানি গদ্যকাব্য—অর্থাৎ, ছন্দোবদ্ধ গদ্যে লেখা কাব্য। গদ্যে লেখা হইলেও ইহার রচনার মধ্যে একটি ছন্দ আছে, তাল আছে এবং কবিতার রসও আছে। এই ধরণের রচনা-পদ্ধতি কবির এক নূতন সৃষ্টি। গদ্যের মধ্য দিয়াও কাব্যের ছন্দ যে তরঙ্গায়িত করিয়া তোলা যায় তাহা এই ধরণের কাব্য রচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ চমৎকার ভাবে প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন।

কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালা ভাষাকে যাবতীয় বিশ্ব-সাহিত্যের সহিত এক পংক্তিতে স্থান দিয়াছেন। তাঁহার কবিতার মধ্য দিয়া বিচিত্র ভাব ও কল্পনা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। জগতে যাহা কিছু ছোট, যাহা কিছু তুচ্ছ ও সামান্য, তাহাকেও কবি অসামান্য বলিয়া জানিয়াছেন। কবির 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতার কৃষ্ণকান্ত, 'রাজা ও রাণী' নাটকের ভৃত্য শঙ্কর, 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্ত্তন' গল্পের ভৃত্য রামচরণ, 'দুই বিঘা জমি'র মালিক দরিদ্র উপেন—সকলেই কবির মনকে স্পর্শ করিয়াছে, কেহই তাঁহার কাছে তুচ্ছ বা পর নহে। সমাজে যাহারা সামান্য ও সাধারণ তাহাদের সকলের প্রতি কবির সহানুভূতি আছে। তাহাদের চরিত্রের মধ্যে যে মহত্ত্ব, মাধুর্য্য ও

অসাধারণতা কবি লক্ষ্য করিয়াছেন তাহা তিনি তাঁহার কাব্যে, গল্পে ও নাটকে রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির কবি। রবীন্দ্র-কাব্যে বিশ্বপ্রকৃতির রূপটি সরসসুন্দর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতিকে কবি তাঁহার কাব্যে নূতন করিয়া গড়িয়া নূতন রূপ দান করিয়াছেন। জড় বিশ্বপ্রকৃতিতে কবি প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রকৃতির সেই প্রাণময়ী মূর্ত্তিটি বর্ত্তমান। বর্ষা, বসন্ত, শরৎ, হেমন্ত, শীত, গ্রীষ্ম,—সকল ঋতুর বর্ণনা কবি করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্র-কাব্যে বর্ষা সম্বন্ধীয় কবিতাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কালিদাসের মত রবীন্দ্রনাথ বর্ষার কবি। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধীয় কবিতার ভিতর দিয়া দেখাইয়াছেন যে প্রকৃতি ও মানুষের জীবন একসূত্রে বাঁধা আছে। প্রকৃতির সহিত মানুষের একটা অচ্ছেদ্য বন্ধন উপলব্ধি করিয়া কবি গাহিয়াছেন—

স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে বাধা যে গিঁঠাতে গিঁঠাতে।

জলস্থল আকাশের সহিত একটা নিবিড় একাত্মতা ও নিজেকে বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত শোভা সৌন্দর্য্যের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া বিলাইয়া দিবার আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধীয় বহু কবিতাতেই আছে। কবি অনুভব করেন যে প্রকৃতির সহিত মিলনে আনন্দ—বিচ্ছেদে দুঃখ ও বিষাদ। কবির বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধীয় কবিতায় এইটি সব চেয়ে বড় কথা।

রবীন্দ্রনাথ স্বদেশ প্রেমিক। বাল্যকাল হইতেই কবির দেশানুরাগ যে কত প্রবল তাহার পরিচয় তাঁহার আত্মজীবনী 'জীবনস্মৃতি'তে এবং তাঁহার বহু কবিতায় পাওয়া যায়। শত অত্যাচারক্লিষ্ট বাঙ্গালীর হীন অবস্থা, দাস্য ও নিশ্চেষ্টতা কবির চিত্তকে পীড়িত করিয়াছে। স্বদেশের যে-সব লোক নীরবে শত শতাব্দীর অত্যাচারের ভারে

পিষিয়া মরিতেছে, অথচ কোনও প্রতিকার করিতে পারিতেছে না, তাহাদের উদ্দেশ্য করিয়া কবি বলিয়াছেন—

এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা ; ডাকিয়া বলিতে হবে—
মুহূর্ত্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে !
যার ভয়ে ভীত তুমি, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পালাইবে ধেয়ে,—

বঙ্গমাতা স্নেহাধিক্যে ক্রমাগত বিধি-নিষেধের গণ্ডী দিয়া তাঁহার সন্তানদের পঙ্গু নিশ্চেষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। তাহাতে কবি ব্যথিত হইয়া বলিয়াছেন—

সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী
রেখেছো বাঙ্গালী করে মানুষ করনি !

কবি বুঝিয়াছেন যে বাঙ্গালীকে মানুষ হইতে দিলে তবেই দেশের মঙ্গল, নচেৎ নয়। সেইজন্য নববর্ষে কবি সমস্ত ভারতবাসীর হইয়া বলিতেছেন—

নব বৎসরে করিলাম পণ
লবো স্বদেশের দীক্ষা,
তব আশ্রমে, তোমার চরণে,
হে ভারত, লবো শিক্ষা।
পরের ভূষণ, পরের বসন,
তেয়াগিবো আজ পরের অশন,
যদি হই দীন, না হইব হীন,
ছাড়িব পরের ভিক্ষা।

দেশপ্রেমিক কবি স্বদেশ জননীর নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছেন—

নিজ হস্তে শাক-অন্ন তুলে দাও পাতে, তাই যেন রুচে,—
মোটা বস্ত্র বুনে দাও যদি নিজ হাতে, তাহে লজ্জা ঘুচে।

বঙ্গভূমিকে ভালবাসিয়া তিনি বারবার বলিয়াছেন—

আমার সোনার বাংলা,
আমি তোমায় ভালবাসি,—
চিরদিন তোমার আকাশ,
তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

এবং—

তোমার ধুলামাটি অঙ্গে মাখি'
ধন্য জীবন মানি।

বঙ্গদেশে জন্মিয়া কবি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করেন—

সার্থক জনম আমার, জন্মেছি এই দেশে ;
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালবেসে !

স্বদেশভক্ত কবি ভারতের উচ্চ নীচ কৃত্রিম ভেদাভেদ ও বিরোধ দূর করিবার কথা বলিয়াছেন। এই উচ্চ নীচ ভেদাভেদ ভুলিলে তবেই আমাদের পরাধীনতার গ্লানি ঘুচিবে।

হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছো অপমান,
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেমে কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা, অতীত গৌরবের অতিপূজা এবং বিদেশ ও বিদেশীর প্রতি অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ নাই। কবির 'ভারত-তীর্থ' শীর্ষক কবিতাটি ইহার উজ্জ্বল উদাহরণ। পুণ্যতীর্থ ভারতবর্ষকে কবি সকল জাতির মিলনক্ষেত্র বলিয়াছেন—

এসো হে আর্য্য, এসো অনার্য্য, হিন্দু মুসলমান,
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃষ্টান।
এসো ব্রাহ্মণ শুচি করি মন, ধরো হাত সবাকার,
এসো হে পতিত হোক্ অপনীত সব অপমান ভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা।
সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ-নীরে।
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

রবীন্দ্রনাথ চির-তরুণ। এই চির-তরুণ কবি আমাদের দেশের তরুণদের যে বাণী শুনাইয়াছেন তাহা মূল্যবান্—দেশের পক্ষে কল্যাণকর।

বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখ-তাপে ব্যথিত চিতে নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখ যেন করিতে পারি জয়।
সহায় মোর না যদি জুটে,
নিজের বল না যেন টুটে,
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি,
লভিলে শুধু বঞ্চনা,
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।

কবি চাহেন যে তরুণেরা এই মহামন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করুক। কবি প্রার্থনা করিতেছেন যে তাহারা যেন দুঃখ জয় করিয়া মহৎ উদার হইতে পারে।

সর্ব্বোপরি রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য্যের কবি। কবি তাঁহার বিভিন্ন কবিতায় সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীকে নানা বিচিত্রতায় নানাভাবে উপলব্ধি

করিয়াছেন। নিছক সৌন্দর্য্যের বন্দনা রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতায় উজ্জ্বল রত্নের মত দেদীপ্যমান্।

কবি জীবনকে নব নব রূপ ও রূপক দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; মরণকেও তিনি নূতন রূপ, মাহাত্ম্য ও মাধুর্য্য দান করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদের দেশের কোনও কবি মরণকে এমন বরণীয় বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই—

"মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান!"

অভিনব ভাব-লহরীর সহিত অপরূপ ছন্দের সম্মিলনে রবীন্দ্র-কাব্য বাঙ্গালা সাহিত্যের এক নূতন সম্পদ্। সংস্কৃত সাহিত্যের সৌন্দর্য্যরাশি এবং ইউরোপীয় সাহিত্যের ভাবৈশ্বর্য্য রবীন্দ্র-সাহিত্যে মিলিত হইয়া অপূর্ব্ব কল্পলোকের সৃষ্টি করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলায় বড় দুঃখে বলিয়াছিলেন—

বিশ্বের মাঝে ঠাঁই নাই বলে কাঁদিতেছে বঙ্গভূমি,
গান গেয়ে কবি জগতের কোলে ঠাঁই করে দাও তুমি।

কবির সেই কামনা সফল হইয়াছে।

কেবল কাব্যসাহিত্য কেন, বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্য, উপন্যাস-সাহিত্য, ছোটগল্প, প্রবন্ধসাহিত্য প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের দানে সুসমৃদ্ধ।

রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্য বিশেষত্বমণ্ডিত। নাট্য সাহিত্যে তিনি প্রচলিত নাটক-রচনার আদর্শের অনুসরণ করেন নাই। বিসর্জ্জন, ফাল্গুনী, অচলায়তন, ডাকঘর, রাজা, মুক্তধারা, তপতী, মায়ার খেলা, বাল্মীকি-প্রতিভা, মালিনী, শারদোৎসব, চণ্ডালিকা, নটীর পূজা প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের নাটক। এই সকল নাটক ঘটনা-প্রধান নহে। এগুলিকে রূপক নাট্য বলা হয়। বাহিরের ঘটনাস্রোতের সহিত এই নাটকগুলির যোগ অল্প। তাই এই সকল নাটকে নাট্য বা চরিত্রের

ঘাত-প্রতিঘাত প্রভৃতি মুখ্য নহে, গীতই মুখ্য। গীতিবহুলতা রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিকে মনোরম এবং অপূর্ব্ব করিয়া তুলিয়াছে। এই শ্রেণীর নাটকে কোনও বিশেষ গল্প বা প্লট নাই—আছে কেবল একটা অনুভূতির প্রকাশ।

উপন্যাসেও রবীন্দ্রনাথ নূতন পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার উপন্যাসের ভিতর দিয়া তিনি সমাজের বহু সমস্যার অবতারণা করিয়াছেন এবং তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। গোরা, ঘরে বাইরে, নৌকাডুবি, চোখের বালি, শেষের কবিতা, যোগাযোগ, দুই বোন, চার অধ্যায় প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস। এই সকল উপন্যাসের ভাষা ও বর্ণনাকৌশল চমৎকার। চরিত্র-চিত্রণেও রবীন্দ্রনাথ অসীম ক্ষমতা ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দান করিয়াছেন। তাঁহার উপন্যাসের চরিত্রগুলি যেন জীবন্ত। চরিত্র সৃষ্টি করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ নরনারীর অন্তর্জগতের রহস্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন, এই জন্য তাঁহার উপন্যাস বাঙ্গালা সাহিত্যে যুগান্তর আনিয়াছে। মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া চরিত্র বিশ্লেষণ রবীন্দ্র-পূর্ব্ব বাঙ্গালা সাহিত্যে ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পগুলি অতুলনীয়। তাঁহার 'গল্পগুচ্ছ' ছোটগল্প-সাহিত্যের কৌস্তুভ মণি। বিশ্বসাহিত্যে এমন সুন্দর ছোট গল্প খুব অল্পই আছে। ছোটগল্প-রচয়িতা হিসাবে রবীন্দ্রনাথ জগতের যে কোনও শ্রেষ্ঠ গল্পলেখকের সমকক্ষ। রবীন্দ্রনাথ কবি। সেইজন্য তাঁহার ছোটগল্পগুলিতে প্রচুর কাব্যসম্পদ বিদ্যমান। তাঁহার ছোটগল্পে আমরা পাই গগনবিহারী কল্পনার প্রসার এবং ভাবে ভরা মধুর সঙ্গীতময় ভাষার কম্পন। কবির অন্তর্দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। তাই তাঁহার ছোট গল্পে মানব-হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতি এবং তাহাদের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। তাঁহার ছোট গল্পে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ প্রাধান্য লাভ

করিয়া গল্পগুলির মনোজ্ঞতা বাড়াইয়া দিয়াছে। গল্পগুলির বিষয় সামান্য হইলেও তাহার মধ্যে অভিব্যক্ত হইয়াছে মানব-হৃদয়ের গোপনতম কাহিনী—তাহার চিরন্তন সমস্যা। ছোটগল্প রচনায় রবীন্দ্র-নাথের প্রতিভার বিশেষত্ব এই যে তিনি মানব-জীবনের ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কথাগুলি অতি নিপুণতার সহিত আমাদের সম্মুখে মেলিয়া ধরিয়াছেন। ছোটগল্পের স্বল্প পরিসরের মধ্যে চরিত্র-বিশ্লেষণ পটুতাও রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ। কাবুলিওয়ালা, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্ত্তন, মাষ্টার মহাশয়, শুভা, পোষ্টমাষ্টার, ছুটি, দেনা পাওনা প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গল্প। 'গল্পগুচ্ছের' প্রত্যেকটি গল্পই হীরকখণ্ডের মত ভাস্বর।

সমালোচনায় ও প্রবন্ধ সাহিত্যেও রবীন্দ্রনাথের স্থান অতি উচ্চে। শিক্ষা, সমাজ ও সাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি যে সকল সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার গভীর জ্ঞান, সহৃদয়তা ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার রচিত প্রবন্ধ সাহিত্য ভাষার অভিনবত্বে ও ভাব-গভীরতায় বাঙ্গালা ভাষার অমূল্য সম্পদ্।

রবীন্দ্রনাথ যে প্রধানতঃ কবি তাহা যে কেবল তাঁহার গল্প উপন্যাস পাঠ করিয়া বুঝা যায় তাহা নহে; তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়াও বুঝা যায় যে তিনি কবি। তাঁহার প্রবন্ধসমূহের সমস্ত তত্ত্ব ও তথ্যের ফাঁকে ফাঁকে বিশুদ্ধ কাব্যরস ছড়াইয়া আছে। যুক্তির সহিত কল্পনার একটি সুন্দর সরস সমাবেশ রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্যের বিশেষত্ব। তাঁহার প্রবন্ধ-গুলিতে তত্ত্ব কিছু কম নাই, তথ্যও বহুল পরিমাণে পাওয়া যাইবে, কিন্তু তাহার চেয়েও বড় জিনিস প্রবন্ধে তাঁহার সূক্ষ্ম আদর্শবাদ, কল্পনার প্রসার এবং প্রকাশ ভঙ্গীর মাধুর্য্য। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্য পড়িবার পর মনে হয় যে তিনি সত্য প্রকাশ করিয়াছেন সোজা করিয়া নয়,

সুন্দর করিয়া। সাহিত্য, লোক সাহিত্য, বিচিত্র প্রবন্ধ, সমাজ, সমূহ, স্বদেশ, শিক্ষা, ধর্ম্ম, পঞ্চভূত প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত প্রবন্ধগ্রন্থ।

রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। বিজ্ঞান এবং ভাষাতত্ত্বের জটিল বিষয়গুলি কবির লেখনীর যাদুস্পর্শে সরস-সুন্দর হইয়াছে। 'বিশ্বপরিচয়' ও 'শব্দতত্ত্ব' নামক গ্রন্থ দুইখানি যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পুস্তক।

ইউরোপ যাত্রীর ডায়েরী, রাশিয়ার চিঠি, জাপান যাত্রীর ডায়েরী, যাত্রী, ছিন্নপত্র প্রভৃতিতে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন দেশভ্রমণের কথা লিপিবদ্ধ আছে। কবির সম্পূর্ণ পরিচয় পাইতে হইলে এই সকল গ্রন্থ অবশ্যপাঠ্য।

ইংরেজী ভাষার উপর রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ দখল। তিনি নিজেই তাঁহার বহু কাব্যের ও গদ্যগ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন। সেগুলি ইউরোপ ও আমেরিকায় বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। Gitanjali, The Gardener, The Crescent Moon, Fruit Gathering, The Fugitive, Home and the World, Sacrifice, The King and Queen, Malini, The Cycle of the Spring প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী কাব্য, নাটক, গল্পগ্রন্থ ও উপন্যাস। ইংরেজীতে রবীন্দ্রনাথের কাব্য, নাটক, গল্প ও উপন্যাস পাঠ করিয়া পাশ্চাত্য দেশবাসিগণ মুগ্ধ হইয়াছেন। বাঙ্গালায় মূল রবীন্দ্র-কাব্যের রসাস্বাদন করিবার আগ্রহও তাঁহাদের কম নহে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাইবার মানসে ইউরোপে আজকাল কেহ কেহ বাঙ্গালা শিখিয়া থাকেন। ইহা বাঙ্গালার বিশেষ সম্মানের কথা সন্দেহ নাই।

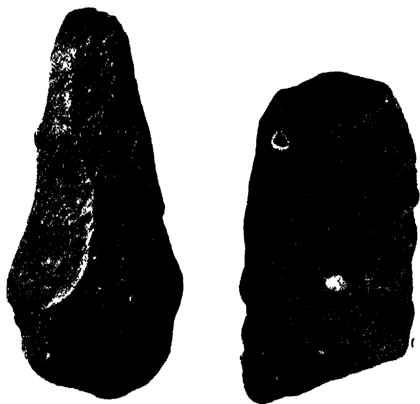
আজ রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি দেশে বিদেশে পরিব্যাপ্ত। বাঙ্গালা ভাষা-সরস্বতীকে একদিন তিনি মৌনা দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিতা

দেখিয়াছিলেন। কিন্তু জীবনব্যাপী সাধনায় তিনি বঙ্গবাণীর অপ্রকাশের বেদনার লাজুকতা ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষাকে তিনি অপরূপ করিয়া সাজাইয়া বিশ্বসাহিত্যের আসরে একটি সম্মানের আসন দান করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষার মধুর বেণু-বীণানিক্বণে আজ বিশ্ববাসী মুগ্ধ ও বিস্মিত। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগৎ কবি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া শতমুখে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতেছে। রবীন্দ্রনাথের মত এত বড় একজন প্রতিভাবান্ সাহিত্যিক জগতে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যস্থষ্টিতে বঙ্গভাষা উর্ব্বরা শস্যশ্যামলা হইয়া উঠিয়াছে। একদিন যে ভাষায় ক্ষীণধ্বনি একতারা যন্ত্রের মত কেবল গ্রাম্য রাগিণী বাজিত, রবীন্দ্রনাথ তাহাতে একটির পর একটি তার চড়াইয়া তাহাকে বীণাযন্ত্রে পরিণত করিয়াছেন। আমাদের কবির চিত্ত সপ্ততন্ত্রী বীণার মত—তাহাতে কত বিভিন্ন স্থর, কত মূর্চ্ছনাই না ধ্বনিত হইতেছে! এমন বহুমুখী প্রতিভা জগতের সাহিত্যে আর নাই। তিনি বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যকে বিশ্বসভায় বন্দিত হইবার উপযুক্ত সামর্থ্য ও সৌন্দর্য্য দান করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের দৈবী-প্রতিভা বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যকে একার্দ্ধ শতাব্দীকালের মধ্যে এক সহস্র বর্ষের সমৃদ্ধি দান করিয়াছে!

ভারতের শিল্প

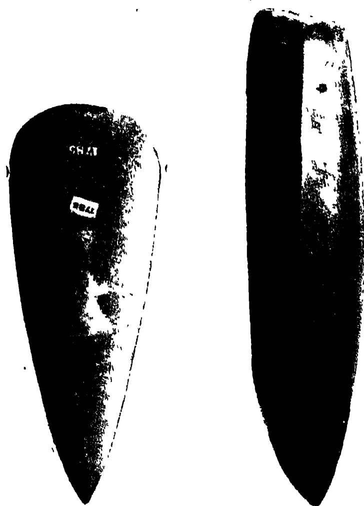
প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতের ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন; মানুষের স্বভাবজাত শিল্পসৃষ্টির প্রবৃত্তি তখন কতখানি পরিস্ফুট হইয়াছিল তাহা স্পষ্টভাবে জানিবার উপায় নাই। ভারতের আদিমতম অধিবাসীরা জীবিকানির্ব্বাহের জন্য এবং বন্য পশুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য পশুবধ করিত। এই কার্য্যের জন্য তাহারা প্রস্তরনির্ম্মিত অস্ত্র ব্যবহার করিত। অস্ত্রগুলি নিতান্ত অমসৃণ থাকিত, তাহাদের মুখ যথেষ্ট তীক্ষ্ণ করিবার কৌশল সেকালের মানুষ জানিত না। এই সকল অস্ত্র দাক্ষিণাত্যে পাওয়া গিয়াছে। আর্য্য জাতির ভারতে আগমনের বহুকাল পূর্ব্বে এই অস্ত্রগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী যুগের অধিবাসিগণের সহিত এই আদিম অধিবাসীদের জাতিগত কোন সম্বন্ধই ছিল না।



পুরাতন প্রস্তর যুগের অস্ত্র

তারপর বর্ত্তমান দ্রাবিড় জাতিসমূহের পূর্ব্বপুরুষেরা ভারতে উপস্থিত হইল। তাহারাও প্রস্তরনির্ম্মিত অস্ত্র ব্যবহার করিত, কিন্তু অস্ত্রের

মস্থণতা সম্পাদন করিতে তাহারা জানিত। এই সকল অস্ত্রের সহিত প্রাগৈতিহাসিক যুগে পশ্চিম এশিয়ায় ব্যবহৃত অস্ত্রের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এজন্য কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে দ্রাবিড় জাতির পূর্ব্ব-পুরুষগণ পশ্চিম এশিয়া হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল।



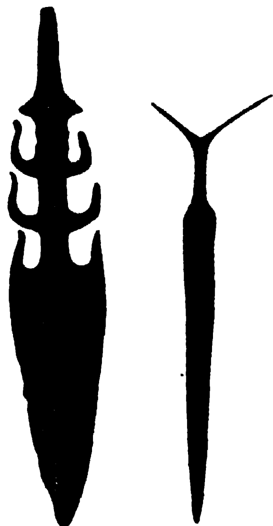
নূতন প্রস্তর যুগের অস্ত্র

প্রস্তর যুগের পর ভারতীয় সভ্যতায় তাম্র যুগের আবির্ভাব হইল। এই যুগে মানুষ তাম্রনির্ম্মিত অস্ত্র ব্যবহার করিতে শিখিয়াছিল। বাঙ্গালা দেশ হইতে বেলুচিস্থান পর্য্যন্ত উত্তর ভারতের সর্ব্বত্র বহু তাম্রনির্ম্মিত অস্ত্র পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু দাক্ষিণাত্যে কোন তাম্রনির্ম্মিত অস্ত্র পাওয়া যায় নাই।

অতঃপর লৌহের ব্যবহার প্রচলিত হইল। খৃষ্টপূর্ব্ব একাদশ শতাব্দীতে ভারতবাসীরা লৌহের ব্যবহার জানিত। সেই যুগে পশ্চিম এশিয়াতেও লৌহের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। সেইজন্য কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে ভারতীয়েরা পশ্চিম এশিয়ার অধিবাসীদের নিকট হইতেই লৌহের ব্যবহার শিখিয়াছিল।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভারতীয়েরা কেবল যে অস্ত্র-শস্ত্র নির্ম্মাণেই নিপুণ ছিল তাহা নহে। সেই যুগে ভারতের বন্যজাতিসমূহ চিত্রকলার

চর্চ্চাও করিত। তাহার কয়েকটি নিদর্শন মধ্যভারত, উড়িষ্যা এবং আগ্রা-অযোধ্যা সংযুক্ত প্রদেশে কয়েকটি পার্ব্বত্য গুহাগহ্বরে পাওয়া গিয়াছে। পশুর চর্ব্বির সহিত রঙ মিশাইয়া আদিম যুগের মানুষ ছবি আঁকিত। ছবির বিষয়বস্তু ছিল তাহার প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার সহিত সংশ্লিষ্ট—অর্থাৎ জীবজন্তুর প্রতিকৃতি, যুদ্ধ ও শিকারের কাহিনী প্রভৃতিই আদিম যুগের মানুষেরা অঙ্কন করিত। অনেকে মনে করেন যে বাঙ্গালা দেশের আল্পনা আঁকিবার রীতি আদিম কালের অঙ্কন-রীতিরই পরিণতি মাত্র।



তাম্রযুগের অস্ত্র

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী প্রত্নতাত্ত্বিক স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় সিন্ধু নদের উপত্যকায় মোহেঞ্জোদড়ো এবং হরপ্পা নামক দুইটি স্থানে মৃত্তিকার নিম্ন হইতে প্রাগৈতিহাসিক ভারতীয় সভ্যতার বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এতদিন ঐতিহাসিকগণের ধারণা ছিল যে আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব্ব ২০০০ অব্দে আর্য্য জাতির ভারতে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে সভ্যতার সূত্রপাত হইয়াছিল, কিন্তু এই আবিষ্কারের ফলে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইল যে যীশুখৃষ্টের জন্মের তিন সহস্র বৎসরের অধিককাল পূর্ব্বেও সিন্ধুনদের উপত্যকায় এক সুসভ্য জাতি বাস করিত। "পশ্চিম এশিয়ার অধিবাসী প্রাচীন সুমের জাতির সভ্যতার সহিত প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু-সভ্যতার সংযোগ



বিরাট স্নানাগার, মোহেঞ্জোদড়ো

ছিল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, দ্রাবিড়গণই সিন্ধু দেশের এই প্রাচীন সভ্যতার জন্মদাতা। এতদিন মিশর, সুমের এবং চীনকে মানব-সভ্যতার আদিম কেন্দ্র বলিয়া বর্ণনা করা হইত; কিন্তু এখন ভারতবর্ষে পাঁচহাজার বৎসরেরও অধিককাল পূর্ব্বের এই উন্নত সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রমাণিত হইল যে ভারতবর্ষও সভ্যতার একটি সুপ্রাচীন কেন্দ্র।"*

শিল্পকলার তিনটি অঙ্গ—স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলা। মোহেঞ্জোদড়োর শিল্পীরা যে এই তিনটি শাখাতেই কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছিল তাহার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। সিন্ধু-সভ্যতা ছিল নাগরিক সভ্যতা; কয়েকটি বৃহৎ নগরের ধ্বংসাবশেষই মোহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার প্রধান কীর্ত্তি। সেখানে বাসগৃহ, স্নানাগার এবং দেবালয়ের যে ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে তাহা স্থাপত্য শিল্পের বিশেষ উন্নতির পরিচয় প্রদান করে। একটি বৃহৎ স্নানাগার ১৮০ ফুট প্রস্থ; তাহা আধুনিক কালের বহু স্নানাগার অপেক্ষা সুন্দর। অভিজাতগণের বাসগৃহ দ্বিতল ছিল। চাকরদের থাকিবার ঘর এবং রান্নাঘর নীচে ছিল; বাড়ীর মালিক সপরিবারে দ্বিতলে বাস করিতেন। নগরের পয়ঃপ্রণালীগুলি অতি উৎকৃষ্ট ছিল। ছাদ হইতে জলনিকাশের সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। সেকালে পৃথিবীর আর কোন জাতি নগর নির্ম্মাণে এতখানি কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারে নাই।

মোহেঞ্জোদড়োর শিল্পীরা যে সকল জীব-জন্তুর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ ও অঙ্কন করিয়াছে তাহা ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলায় তাহাদের অসামান্য প্রতিভার

---

* শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার প্রণীত 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', ১১ পৃষ্ঠা।

পরিচায়ক। শিল-মোহরের উপর অঙ্কিত বৃষ প্রভৃতি পশুর প্রতিকৃতি এমন জীবন্ত যে প্রাচীন শিল্পে তাহার তুলনা পাওয়া কঠিন। সেই সুপ্রাচীন যুগে পালিশ করা চীনা মাটির বাসনের উপর পাতা, ফুল, পাখী এবং হরিণ প্রভৃতি পশুর চিত্র অঙ্কিত হইত। "মোহেঞ্জোদড়ো এবং হরপ্পায় প্রাপ্ত মনুষ্য-মূর্তিগুলির মধ্যে একটি পুরুষের নিটোল দেহের আদর্শ এবং অপর একটি নারী-মূর্তিতে রমণীসুলভ কমনীয়তা



হরপ্পায় প্রাপ্ত শিল-মোহর





মোহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত মনুষ্যমূর্তি

অতি সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। অধিকাংশ মূর্ত্তির মস্তক ও হস্তপদাদি ভগ্ন অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে।" *

যীশুখৃষ্টের জন্মের আনুমানিক তুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্য জাতি ভারতবর্ষে আগমন করেন। এই ঘটনা হইতে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের স্থাপনকাল (খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দী) পর্য্যন্ত প্রায় ষোলশত বৎসরের ইতিহাস এখনও আমাদের অজ্ঞাত বলিলেই চলে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে ভারতীয় শিল্প কোন্ দিকে কতখানি উন্নতি লাভ করিয়াছিল তাহা সঠিকভাবে নির্দ্ধারিত হয় নাই। বৈদিক যুগের স্থাপত্য সম্বন্ধে আমাদের কোনও ধারণা নাই, কারণ সেকালের কোন গৃহ বা প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে বেদে বাস্তু-শিল্পের উল্লেখ থাকায় মনে হয় যে গৃহ-নির্ম্মাণের পারিপাট্যের প্রতি শিল্পীদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে বিহারের অন্তর্গত লৌরিয়া নন্দনগড় নামক স্থানে মাটি খুঁড়িয়া কয়েকটি শ্মশানের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে এই শ্মশানগুলি বৈদিক যুগের স্মৃতি বহন করিতেছে, কিন্তু এই মত গ্রহণযোগ্য কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। একটি শ্মশানে স্বর্ণনির্ম্মিত একটি ক্ষুদ্র স্ত্রীমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। বেদে যে ধরিত্রী দেবীর উল্লেখ আছে সম্ভবতঃ উহা তাঁহারই মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব্ব ৮০০ অব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। ইহাই বৈদিক যুগের ভাস্কর্য্যের একমাত্র নিদর্শন।



স্বর্ণনির্ম্মিত স্ত্রীমূর্ত্তি
(ধরিত্রী দেবী ?)
—বৈদিকযুগ

খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বুদ্ধদেবের জীবনকালে উত্তর ভারতের

---

* শ্রীঅসিতকুমার হালদার প্রণীত 'ভারতের শিল্প-কথা', ৫৫ পৃষ্ঠা।

নানাস্থানে বহু সমৃদ্ধ নগর বর্ত্তমান ছিল। বৌদ্ধ সাহিত্যে কৌশাম্বী, শ্রাবস্তী, রাজগৃহ প্রভৃতি নগরের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সকল স্থানে শিল্পের বিশেষ উৎকর্ষ হইয়াছিল। বর্ত্তমান এলাহাবাদ হইতে ত্রিশ মাইল দূরে যমুনার তীরে অবস্থিত কোসাম গ্রামে কৌশাম্বীর ভগ্নাবশেষ ভূগর্ভে প্রোথিত আছে। এখানে এখনও খননকার্য্য সুসম্পন্ন হয় নাই। শ্রাবস্তীও আগ্রা-অযোধ্যা সংযুক্ত প্রদেশে অবস্থিত ছিল; এই স্থানের বর্ত্তমান নাম সাহেত-মাহেত। পুরাতন রাজগৃহ সহরে কয়েকটি অট্টালিকার যে ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে তাহাই পূর্ব্ব ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের প্রাচীনতম নিদর্শনরূপে গণ্য করা যাইতে পারে। রাজগৃহ বর্ত্তমান বিহার প্রদেশে অবস্থিত ছিল। ইহা সেকালে মগধ রাজ্যের রাজধানী ছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মগধরাজ বিম্বিসার পুরাতন রাজগৃহ হইতে নূতন রাজগৃহে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। পুরাতন রাজগৃহ শহরের অট্টালিকাসমূহ প্রস্তর নির্ম্মিত ছিল, কিন্তু সেকালে অট্টালিকা নির্ম্মাণের জন্য প্রস্তরের ব্যবহার বিশেষভাবে প্রচলিত হয় নাই। গ্রীক লেখকেরা বলিয়াছেন যে নদীর তীরে অবস্থিত শহরগুলি কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিত হইত এবং নদী হইতে দূরে অবস্থিত শহরগুলি মাটি অথবা ইটদ্বারা গঠিত হইত। খনন কার্য্যের ফলে এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। নদীতীরবর্ত্তী পাটলিপুত্র শহরে রাজপ্রাসাদও কাষ্ঠনির্ম্মিত ছিল, কিন্তু নদী হইতে দূরে অবস্থিত শ্রাবস্তীতে মাটি ও ইটের নির্ম্মিত অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে।

খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে মগধরাজ উদয়ী গঙ্গা নদী এবং শোণ নদের সঙ্গমস্থলে কুসুমপুর বা পাটলিপুত্র নগর স্থাপন করেন। মৌর্য্য এবং গুপ্তবংশীয় সম্রাট্‌গণের রাজধানীরূপে পাটলিপুত্র তখন সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল।

মৌর্য্য বংশের স্থাপয়িতা প্রতাপশালী সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত এই পাটলিপুত্র নগরে কাষ্ঠনির্ম্মিত এক বিশাল প্রাসাদে বাস করিতেন। গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস বহুদিন চন্দ্রগুপ্তের সভায় অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে পাটলিপুত্র দৈর্ঘ্যে প্রায় দশ মাইল এবং প্রস্থে প্রায় দুই মাইল বিস্তৃত ছিল। নগরের চতুর্দ্দিকে একটি প্রশস্ত ও গভীর পরিখা ছিল। নগরটি একটি সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল; সেই প্রাচীরে ৫৭০টি স্তম্ভ এবং ৬৪টি তোরণ ছিল। সেকালে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বড় বড় নগরের চারিদিকে পরিখা খনন এবং প্রাচীর নির্ম্মাণ করা হইত।

চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ পাটনার নিকটবর্ত্তী কুমরাহার গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই প্রাসাদে একশত সুবৃহৎ ও সুমসৃণ স্তম্ভ ছিল; তাহার মধ্যে আশীটি এখনও বর্ত্তমান আছে। জনৈক প্রাচীন গ্রীক লেখক বলিয়াছেন যে পারস্যের মহাপরাক্রান্ত সম্রাট্‌গণের প্রাসাদও মৌর্য্য প্রাসাদের তুলনায় হীনপ্রভ মনে হইত। প্রাসাদের মধ্যবর্ত্তী উদ্যানে গৃহপালিত ময়ূর এবং অন্যান্য পক্ষী বিচরণ করিত। বহু সুদৃশ্য কুঞ্জ এবং লতাগৃহ সেই উদ্যানের শোভাবর্দ্ধন করিত। প্রাসাদের নানা অংশে কৃত্রিম জলাশয় ছিল। সেই সকল জলাশয়ে বৃহদাকার মৎস্যসমূহ বিচরণ করিত। সেকালের ভারতবর্ষে শিল্প ও সৌন্দর্য্যবুদ্ধির কতখানি বিকাশ হইয়াছিল তাহার পরিচয় এই গ্রীক বিবরণে পাওয়া যায়।

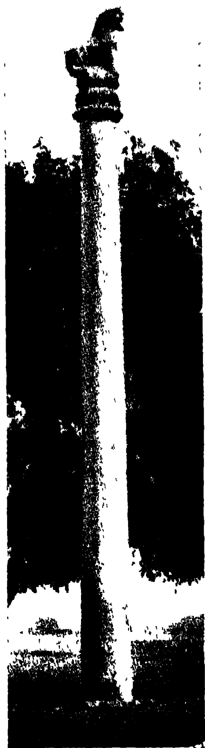
অশোকের সময়ে নূতন উপকরণ এবং নূতন ভাবধারা ভারতীয় শিল্পে নূতন প্রাণের সঞ্চার করিয়াছিল। তাঁহার সময়েই গৃহনির্ম্মাণের জন্য প্রস্তর ব্যবহারের রীতি বিশেষভাবে প্রচলিত হয়। চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদ যদি কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত হইত তবে তাহার

কোন কোন অংশ অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করিত। অশোক কাষ্ঠ ব্যবহারের রীতি পরিত্যাগ করায় তাঁহার কীর্ত্তি বিলুপ্ত হয় নাই।

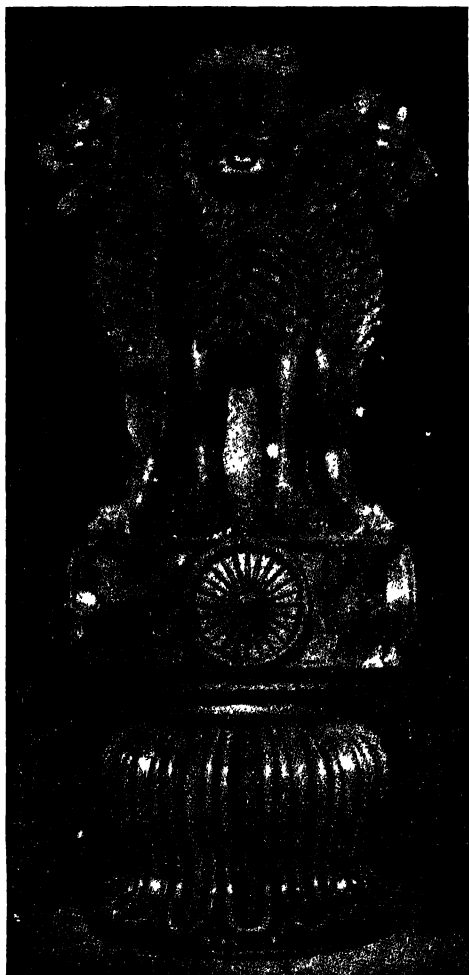
অশোক পাটলিপুত্র নগরের প্রসারণ এবং শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে রাজপ্রাসাদের কোন কোন অংশ প্রস্তর দ্বারা গঠিত হইয়াছিল। অশোকের মৃত্যুর প্রায় সাড়ে ছয় শত বৎসর পরে চীনদেশীয় বিখ্যাত পরিব্রাজক ফাহিয়ান ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি অশোকের প্রাসাদের গঠন ও কারুকার্য্য দর্শনে বিস্মিত হইয়া বলিয়াছেন, "এরূপ শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শন মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে, ইহা দানবের কীর্ত্তি।"

সমগ্র ভারতের অধীশ্বর অশোকের দৃষ্টি কেবলমাত্র পাটলিপুত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। কথিত আছে যে তিনি দুইটি নূতন নগর স্থাপন করিয়াছিলেন—কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর এবং নেপালের অন্তর্গত দেবপত্তন। কাশ্মীরে তিনি নাকি পাঁচশত বৌদ্ধ মঠ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অশোকের মৃত্যুর প্রায় সাড়ে আটশত বৎসর পরে চীনদেশীয় বিখ্যাত পরিব্রাজক ইউয়ান-চোয়াঙ্ ভারতবর্ষে আসিয়া কাশ্মীরে অশোকের নির্ম্মিত প্রায় একশত বৌদ্ধ মঠ দেখিতে পাইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মও অশোকের অনুগ্রহলাভে বঞ্চিত হয় নাই। কাশ্মীরে নির্ম্মিত কয়েকটি অট্টালিকা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মসম্মত উপাসনার জন্য উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। দেবপত্তন নগর স্থাপন সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে। একবার অশোক তাঁহার কন্যা চারুমতী এবং জামাতা দেবপালকে সঙ্গে লইয়া নেপালে গমন করেন। চারুমতী ও দেবপাল তথায় বসতিস্থাপন করেন এবং বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণের জন্য দুইটি মঠ নির্ম্মাণ করেন। সম্রাটের আগমনের স্মৃতি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য দেবপত্তন নগর নির্ম্মিত হয়।

অশোক তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বহু 'বিহার' বা বৌদ্ধমঠ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। 'মহাবংশ' নামক পালিভাষায় রচিত বিখ্যাত গ্রন্থে একটি মনোহর প্রবাদ লিপিবদ্ধ আছে। একদিন অশোক তাঁহার গুরু মোগ্‌গলিপুত্র তিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবান্ বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্ম্মের আয়তন কতখানি?" তিষ্য উত্তর করিলেন, "ধর্ম্ম ৮৪,০০০ শাখায় বিভক্ত।" অশোক বলিলেন, "প্রত্যেকটি শাখার জন্য আমি একটি বিহার নির্ম্মাণ করিব।" অতঃপর তিনি ভারতের বিভিন্ন অংশে ৮৪,০০০ 'বিহার' নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিলেন। এই প্রবাদ সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও, অশোক যে বহু 'বিহার' নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ঐতিহাসিকগণ কয়েকটির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছেন।


লৌরিয়া নন্দনগড় স্তম্ভ

সম্ভবতঃ অশোকের রাজত্বকালের পূর্ব্বেই রাজপ্রাসাদ ও মন্দিরের সম্মুখে স্তম্ভ নির্ম্মাণের প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। অশোক বহু স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া স্তম্ভগাত্রে ধর্ম্মোপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। দিল্লী, লৌরিয়া নন্দনগড়, এলাহাবাদ, লুম্বিনী, সারনাথ প্রভৃতি স্থানে অশোকের স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল স্তম্ভের অধিকাংশই ভগ্ন। স্তম্ভশীর্ষে অবস্থিত পশুমূর্ত্তিগুলি মৌর্য্য যুগের ভাস্কর্য্যশিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শন। "স্তম্ভের শীর্ষে কোথাও হস্তী, কোথাও অশ্ব, কোথাও বৃষ,



সারনাথ স্তম্ভশীর্ষে সিংহমূর্ত্তি

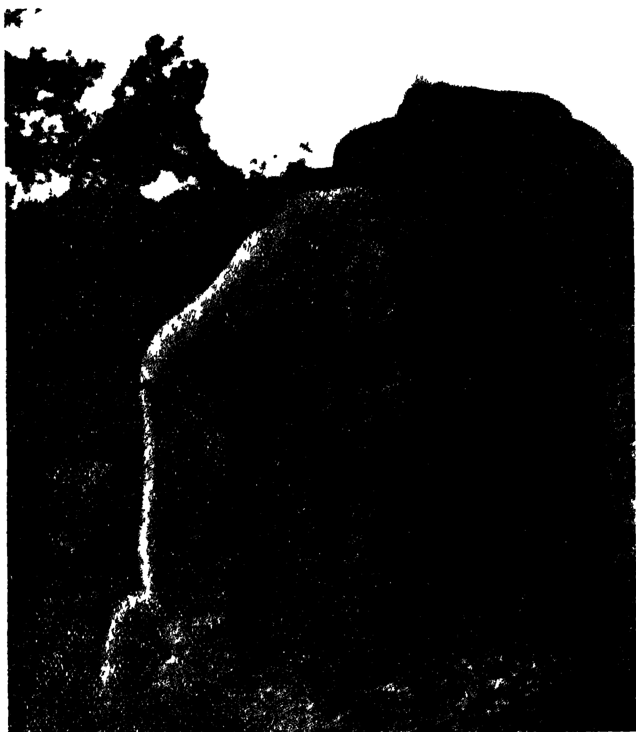
কোথাও বা শিলাময় ধর্মচক্র রচিত ছিল। তাহাদের আসনের নিম্নভাগ কাহারও কাহারও মতে প্রাচীন পারস্যের প্রচলিত রীতি অনুসারে নিম্নমুখী ঘণ্টার অনুকরণে, কাহারও কাহারও মতে অর্দ্ধ-উন্মেষিত শতদলের অনুকরণে পরিকল্পিত। তাহারই নীচে কোথাও বা খাদ্যান্বেষণ রত হংসযূথ ও ধর্মচক্র, কোথাও শতদল ও অন্যপুষ্প।...অশোকের স্তম্ভের পশুগুলি যেমন জীবন্ত ও ভাবব্যঞ্জক তেমনই শক্তি ও মহিমাদ্যোতক।...



সারনাথ স্তম্ভশীর্ষে অশ্বমূর্ত্তি

স্তম্ভগুলির বিশেষত্ব এই যে, তাহা একদিকে যেমন সুঠাম, অন্যদিকে তেমনই অলঙ্কারের বাহুল্য-বর্জ্জিত। প্রত্যেকটি পশু, পক্ষী ও পুষ্প নিপুণতার সহিত নির্ম্মিত, আর স্তম্ভের শীর্ষে কিংবা পাদমূলে কোথাও প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন সজ্জা নাই। স্তম্ভের শোভা তাহার মসৃণতায়।...তখনকার শিল্পের সামঞ্জস্য ও বাহুল্য-হীনতা বাস্তবিকই লক্ষ্য করিবার বিষয়। মানুষের জীবনে অশোক যেমন আতিশয্য পছন্দ

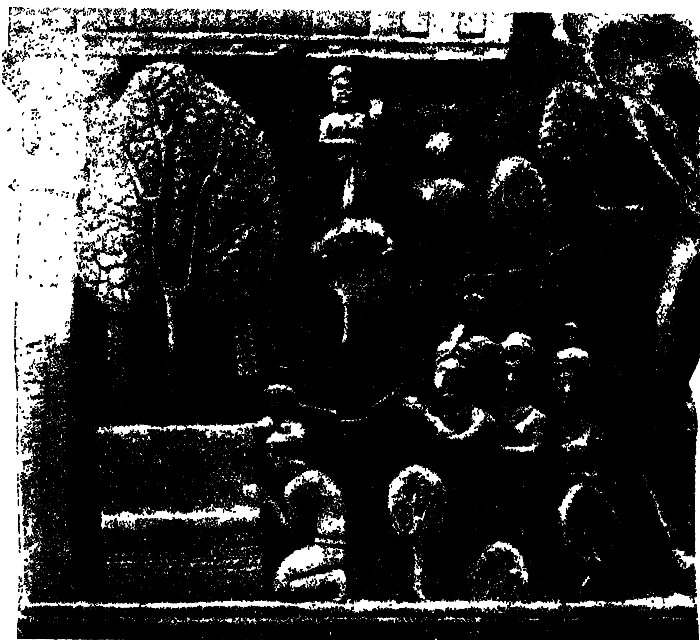
করিতেন না, শিল্পেও তেমনই তিনি কোথাও আতিশয্যের বা অনাবশ্যক অলঙ্কারের প্রশ্রয় দেন নাই।"*



পাহাড় খুদিয়া হাতী তৈয়ার করা হইয়াছে—ধৌলি (উড়িষ্যা)

* শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত 'অশোক', ৬৭-৬৮ পৃষ্ঠা।

অশোকের মৃত্যুর পর মগধে ও মধ্যভারতে শুঙ্গ ও কাণ্ববংশীয় রাজগণের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মধ্যভারতের অন্তর্গত ভারহুত নামক স্থানের বিখ্যাত স্তূপ এই যুগের শিল্পের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই স্তূপ খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহা



ভারহুত স্তূপের একটি চিত্র

ইষ্টকনির্ম্মিত, কিন্তু ইহার তোরণ প্রস্তরনির্ম্মিত। তোরণের বিভিন্ন অংশে বহু চিত্র খোদিত রহিয়াছে। অধিকাংশ চিত্রেই বুদ্ধদেবের জীবনী-সংক্রান্ত কোন কাহিনীকে মূর্ত্তিদানের চেষ্টা করা হইয়াছে। যক্ষ,

যক্ষিণী, নাগ প্রভৃতি উপদেবতার চিত্র এবং কোন কোন হিন্দু দেবতার চিত্রও আছে। চিত্রগুলি বাস্তবিকই মনোরম এবং জীবন্ত। বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ মনে করেন যে কোন কোন চিত্র গ্রীকপ্রথায় শিক্ষিত শিল্পীর দ্বারা খোদিত হইয়াছিল।

খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর প্রথম ভাগে সাঁচী স্তূপের বিখ্যাত তোরণগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল। স্তূপটি এখন প্রায় ৫৪ ফুট উচ্চ। ইহার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ভারহুত স্তূপের তোরণের ন্যায় সাঁচী স্তূপের তোরণেও বহু সুদৃশ্য চিত্র খোদিত



সাঁচী স্তূপের একটি চিত্র

রহিয়াছে। এই চিত্রগুলিও বুদ্ধদেবের জীবনী এবং বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত নানাবিধ উপাখ্যান লইয়া রচিত। সৌন্দর্য্যের দিক হইতে বিচার করিলে এই চিত্রগুলিকে ভারহুত স্তূপের চিত্র হইতে অনেক উচ্চতর স্থান দিতে হইবে। একশত বৎসরের মধ্যে ভারতীয় শিল্প কতখানি উন্নতিলাভ করিয়াছিল তাহার প্রমাণ এখানে পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত অমরাবতীর প্রসিদ্ধ স্তূপটিও সম্ভবতঃ ভারহুত এবং সাঁচী স্তূপের সমসাময়িক। অমরাবতীর ভাস্কর্য্যে গ্রীক প্রভাবের কোন চিহ্ন নাই। অমরাবতীর স্তম্ভে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে বটে, কিন্তু এখানে হিন্দুপ্রভাব সুস্পষ্ট।

বৌদ্ধস্তূপগুলির সন্নিকটে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের বাসের জন্য বিহার বা মঠ এবং তাঁহাদের উপাসনার জন্য চৈত্য নির্ম্মিত হইত। প্রথমে চৈত্যগুলি কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিত হইত; খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে চৈত্যনির্ম্মাণের জন্য প্রস্তর ব্যবহারের রীতি প্রচলিত হয়। বাহির হইতে দেখিলে চৈত্যগুলিকে "অর্দ্ধবৃত্তাকার গরুর গাড়ীর চালার মত খিলান দেওয়া ঘর" বলিয়া মনে হয়। "এই ঘরের শেষের দিকে থাকে একটি বিরাট স্তূপ। স্তূপটিকে বেষ্টন করিয়া শ্রেণীবদ্ধ স্তম্ভদ্বারা নির্ম্মিত অলিন্দ-পরিক্রমা। বিহারগুলির সম্মুখে অর্থাৎ বাহিরের দিকে পাহাড়ের গা কাটিয়া নির্ম্মিত সারি সারি থাম দেওয়া বারান্দা।" বারান্দা অতিক্রম করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেই ভিক্ষুদের বাসোপযোগী সারি সারি প্রকোষ্ঠ দেখা যায়। ভারতের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সমুদয় চৈত্য ও বিহার একই প্রণালীতে নির্ম্মিত। *

বৌদ্ধেরা পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভারতের নানাস্থানে বহু গুহা-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। বঙ্গদেশে সপ্তপর্ণী গুহায় বুদ্ধদেবের জীবিতকালে একটি বৌদ্ধ মহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল। মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত যোগীমারা গুহায় (আনুমানিক ৩০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ) কয়েকটি মানুষ ও জীবজন্তুর চিত্র অঙ্কিত আছে। চিত্রগুলিতে রঙের বৈচিত্র্য নাই, কিন্তু শিল্পকৌশলের পরিচয় আছে। বোম্বাইর নিকটবর্ত্তী কার্লে গুহাটি খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম

---

* শ্রীঅসিতকুমার হালদার প্রণীত 'ভারতের শিল্প-কথা', ২৫-২৬ পৃষ্ঠা।

শতাব্দীতে নির্ম্মিত। এখানে স্থাপত্যকলার চরম উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই চৈত্যের অভ্যন্তরে অবস্থিত উপাসনা-গৃহ ১২৪ ফুট লম্বা



কার্লে গুহার অভ্যন্তর

এবং ৪৫ ফুট প্রশস্ত। একটি অশ্বখুরাকৃতি গবাক্ষপথে ভিতরে আলোক



অজণ্টার একটি চিত্র—বুদ্ধদেব শিষ্যদের প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন

প্রবেশের ব্যবস্থা আছে। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত নাসিকে এবং নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত ইলোরায় কয়েকটি স্থন্দর গুহা-গৃহ আছে।



অজন্তার একটি চিত্র—বিজয়সিংহের সিংহল বিজয়

অজন্তার গুহাগুলি স্থাপত্য ও চিত্রকলার অপূর্ব্ব নিদর্শন। একটি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি পাহাড়ের গা কাটিয়া গুহাগুলি সারি সারি নির্ম্মিত। একপ্রান্তে একটি ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদী। খৃষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া অজন্তার গুহামধ্যে যে সকল চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল তাহা ভারতীয় চিত্রকলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সম্ভবতঃ গুহাগুলি নির্ম্মাণের কিছুকাল পরে চিত্র অঙ্কন আরম্ভ হইয়াছিল। অধিকাংশ চিত্রই বুদ্ধদেবের জীবনী, জাতকের গল্প এবং সেকালের রাজাদের ইতিহাস অবলম্বনে অঙ্কিত। "কোথাও রাজসভার জাঁকজমক, কোথাও ভিখারী বিদায়, কোথাও রন্ধনশালা, কোথাও বা তুরী, ভেরী প্রভৃতি বাদ্যের মিছিলের সঙ্গে রাজা সমারোহে বিজয়-যাত্রায় বাহির হইয়াছেন, কোথাও বা জাহাজে আরোহণ করিয়া সমুদ্রাভিযান হইতেছে, কোথাও বা হস্তীরা কমলদল দলিতেছে, কোথাও সারি সারি পিপীলিকা পলাশ গাছের গুঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেছে, কোথাও বা দাঁড়িপাল্লায় দোকানী জিনিস ওজন করিতেছে, কোথাও বা রাণী মূর্চ্ছিতা হওয়ায় দাসীরা তাঁহার সেবায় নিযুক্ত—এমনি অসংখ্য প্রকারের মানুষের জীবনের ঘটনাকে শিল্পীরা গুহার দেয়ালের উপরে তুলির রেখায় রেখায় সজীব করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। মনে হয় যেন তাঁহারা ছবি আঁকার চূড়ান্ত করিয়া গিয়াছেন—পরবর্ত্তী শিল্পীদের জন্য কিছুই বাকী রাখেন নাই। ছাদের উপর শঙ্খ ও পদ্মপাতা এবং দেয়ালের উপর থেকে নীচু পর্য্যন্ত চিত্র-খচিত—এমন কি বারান্দার পাশেও তাহা বাদ পড়ে নাই।"*

* শ্রীঅসিতকুমার হালদার প্রণীত 'ভারতের শিল্প-কথা', ১৫৬-১৫৭ পৃষ্ঠা।

গোয়ালিয়রের অন্তর্গত বাগগুহার চিত্রাবলীও ভারতীয় শিল্পের চরমোৎকর্ষের পরিচায়ক। গুহাটি নানাস্থানে ভগ্নাবশেষে পরিণত হইয়াছে, তাই চিত্রগুলির সৌন্দর্য্যও অক্ষুন্ন নাই। এখানেও বুদ্ধদেব এবং বৌদ্ধ অর্হতদের মূর্ত্তিই শিল্পীর প্রধান বিষয়বস্তু। নৃত্যকলার একটি চিত্র আধুনিক কালে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। পারস্যদেশীয় পোষাক পরিহিত এক ব্যক্তিকে ঘিরিয়া মহিলারা নৃত্য করিতেছেন, করতাল, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজিতেছে—এই চিত্রটি পারস্যদেশের সহিত ভারতের যোগাযোগ সূচিত করিতেছে।

উড়িষ্যার অন্তর্গত উদয়গিরি এবং খণ্ডগিরি পর্ব্বতে যে সকল গুহা-গৃহ আছে তাহা দশম ও একাদশ শতাব্দীতে জৈন সন্ন্যাসীদের হস্তগত হইয়াছিল। উদয়গিরির ব্যাঘ্রমুখী গুহাটি অতি চমৎকার, দেখিলে মনে হয় যেন একটি ব্যাঘ্র মুখব্যাদন করিয়া আছে। এই স্থানের প্রাকৃতিক শোভা এবং ভাস্কর্য্যের মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"একপারে উদয়গিরি, অপর পারে ললিতগিরি, মধ্যে স্বচ্ছসলিলা কল্লোলিনী বিরূপা নদী নীল বারিরাশি লইয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিয়াছে। গিরিশিখরদ্বয়ে আরোহণ করিলে নিম্নে সহস্র সহস্র তালবৃক্ষ শোভিত, ধান্য বা হরিৎক্ষেত্রে চিত্রিত পৃথ্বী অতিশয় মনোমোহিনী দেখা যায়—শিশু যেমন মার কোলে উঠিলে মাকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী দেখে, মনুষ্য পর্ব্বতারোহণ করিয়া পৃথিবী দর্শন করিলে সেইরূপ দেখে। উদয়গিরি (বর্ত্তমান আল্‌তি গিরি) বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ, কিন্তু ললিতগিরি (বর্ত্তমান নাল্‌তি গিরি) বৃক্ষশূন্য, প্রস্তরময়। এককালে ইহার শিখর ও সানুদেশ অট্টালিকা, স্তূপ এবং বৌদ্ধমন্দিরাদিতে শোভিত ছিল। এখন শোভার মধ্যে শিখরদেশে চন্দনবৃক্ষ, আর মৃত্তিকা-প্রোথিত ভগ্ন

গুহাবশিষ্ট প্রস্তর, ইষ্টক বা মনোমুগ্ধকর প্রস্তর গঠিত মূর্ত্তিরাশি। তাহার দুইচারিটা কলিকাতার বড় বড় ইমারতের ভিতর থাকিলে কলিকাতার শোভা হইত! হায়! এখন কিনা হিন্দুকে ইণ্ডষ্ট্রীয়ল স্কুলে পুতুল-গড়া শিখিতে হয়! কুমারসম্ভব ছাড়িয়া স্থইনবর্ণ পড়ি, গীতা ছাড়িয়া মিল পড়ি, আর উড়িষ্যার প্রস্তরশিল্প ছাড়িয়া সাহেবদের চীনের পুতুল হা করিয়া দেখি। আরও কি কপালে আছে, বলিতে পারি না।

"আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাই লিখিতেছি। সেই ললিতগিরি আমার চিরকাল মনে থাকিবে। চারিদিকে—যোজনের পরে যোজন ব্যাপিয়া—হরিদ্বর্ণ ধান্যক্ষেত্র—মাতা বসুমতীর অঙ্গে বহুযোজন বিস্তৃতা পীতাম্বরী শাটী! তাহার উপর মাতার অলঙ্কার-স্বরূপ তালবৃক্ষশ্রেণী! সহস্র সহস্র, তারপর সহস্র সহস্র তালবৃক্ষ সরল, সুপত্র, শোভাময়! মধ্যে নীলসলিলা বিরূপা নীল-পীত-পুষ্পময় হরিৎ ক্ষেত্র মধ্য দিয়া বহিতেছে—সুকোমল গালিচার উপর কে নদী আঁকিয়া দিয়াছে! তা' যাক—চারিপাশে মৃত মহাত্মাদের মহীয়সী কীর্ত্তি। পাথর এমন করিয়া যে পালিশ করিয়াছিল, সে কি এই আমাদের মত হিন্দু? আর এই সকল প্রস্তর মূর্ত্তি যে খোদিয়াছিল,—এই দিব্য পুষ্পমাল্যাভরণ-ভূষিত বিকশিত চেলাঞ্চল-প্রবৃদ্ধ সৌন্দর্য্য, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর গঠন, পৌরুষের সহিত লাবণ্যের মূর্ত্তিমান সম্মিলনস্বরূপ পুরুষমূর্ত্তি যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু?......এই সকল স্ত্রীমূর্ত্তি যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? তখন হিন্দুকে মনে পড়িল। তখন মনে পড়িল উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক। এই সকল হিন্দুর কীর্ত্তি—এ পুতুল কোন ছার। তখন মনে করিলাম, হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।

"সেই ললিতগিরির পদতলে বিরূপাতীরে গিরির শরীর মধ্যে হস্তীগুম্ফা নামে এক গুহা ছিল। গুহা বলিয়া আবার ছিল বলিতেছি কেন? পর্ব্বতের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কি আবার লোপ পায়? কাল বিগুণ হইলে সকলেই লোপ পায়। গুহাও আর নাই। ছাদ পড়িয়া গিয়াছে, স্তম্ভ সকল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—তলদেশে ঘাস গজাইতেছে। সর্ব্বস্ব লোপ পাইতেছে, গুহাটার জন্য দুঃখে কাজ কি?

"কিন্তু গুহাটা বড় সুন্দর ছিল। পর্ব্বতাঙ্গ হইতে খোদিত স্তম্ভ, প্রাকার প্রভৃতি বড় রমণীয় ছিল। চারিদিকে অপূর্ব্ব প্রস্তরে খোদিত নরমূর্ত্তি সকল শোভা করিত। তাহারই দুই চারিটি আজও আছে। কিন্তু ছাতা পড়িয়াছে, রং জ্বলিয়া গিয়াছে, কাহারও নাক ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও হাত ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও পা ভাঙ্গিয়াছে। পুতুলগুলাও আধুনিক হিন্দুর মত অঙ্গহীন হইয়াছে।"*

মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীক ও শক রাজগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই যুগে গন্ধার প্রদেশে এবং মথুরা অঞ্চলে এক নূতন শিল্প-রীতির উদ্ভব হয়। এই রীতির বিশেষত্ব এই যে ইহাতে গ্রীক প্রভাবের চিহ্ন অতি সুস্পষ্ট। গন্ধার ও মথুরার শিল্পীরা মূর্ত্তি নির্ম্মাণেই বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বেদে এবং পাণিনি ও পতঞ্জলির গ্রন্থে দেব-দেবীর প্রতিমার উল্লেখ থাকিলেও মোহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত মূর্ত্তিসমূহ ব্যতীত অতি প্রাচীনযুগে নির্ম্মিত কোন দেবমূর্ত্তি অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণলাভের পর বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁহার কোন মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয় নাই; বোধিদ্রুম, ধর্ম্মচক্র, বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন প্রভৃতি সঙ্কেত দ্বারা বুদ্ধদেবের

* 'সীতারাম', প্রথম খণ্ড, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

উপস্থিতি সূচিত হইত। গন্ধার এবং মথুরা অঞ্চলে গ্রীক ও কুষাণ রাজত্বকালে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইতে থাকে। গন্ধারে নির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তিগুলি গঠন-কৌশলে ও সৌন্দর্য্যে অতি অনুপম, কিন্তু গ্রীক প্রভাবের আতিশয্য বশতঃ সেগুলি ঠিক ভারতীয় বলিয়া মনে হয় না। মথুরার শিল্পীরা যে সকল বুদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতেন সেগুলি গ্রীকপ্রভাববিমুক্ত না হইলেও খাটি ভারতীয়।


গন্ধারে নির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি

খৃষ্টীয় চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দী ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে এক পরম গৌরবময় যুগ। এই যুগে দিগ্বিজয়ী গুপ্ত সম্রাট্‌গণ ভারতে রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের উৎসাহে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় যে শিল্প-রীতির উদ্ভব হইয়াছিল তাহার সৌন্দর্য্য কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ব্রহ্মদেশ, শ্যাম এবং কম্বোডিয়ার শিল্পিগণও তাহার অনুকরণ

করিয়াছিল। ভাস্কর্য্য শিল্প গুপ্তযুগে বিশেষ উন্নত হইয়াছিল। গুপ্ত-সম্রাট্‌গণ হিন্দু ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; তাই তাঁহাদের সময়ে বহু হিন্দু দেব-দেবীর মন্দির ও মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই যুগে নির্ম্মিত মূর্ত্তিগুলি বাস্তবিকই অতি সুদৃশ্য। সারনাথের বুদ্ধমূর্ত্তি বৌদ্ধ ভাস্কর্য্যের অতি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। দিল্লীতে চন্দ্ররাজের নামাঙ্কিত লৌহনির্ম্মিত যে স্তম্ভ আছে তাহা গুপ্তযুগে ধাতু-শিল্পের উন্নতির চরম নিদর্শন। দেড় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু অদ্যাপি উহাতে কলঙ্ক স্পর্শ করে নাই। গুপ্তবংশীয় নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। অজন্তার বহু চিত্র গুপ্তযুগে অঙ্কিত হইয়াছিল, কিন্তু শিল্পীরা যে গুপ্তসম্রাট্‌গণের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন এরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ নাই।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য বিনষ্ট হইয়া যায় এবং বিভিন্ন প্রদেশে বহু খণ্ডরাজ্যের উদ্ভব হয়। বিভিন্ন প্রদেশের শিল্পও ক্রমশঃ বিভিন্ন রূপ ধারণ করিতে থাকে। চিত্র-শিল্পের ক্রমশঃ অবনতি হয়, কিন্তু স্থাপত্যে ও ভাস্কর্য্যে হিন্দু শিল্পীদের গৌরব বহুদিন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতে দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরাজগণ শিল্পোন্নতির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। পল্লবরাজগণের শিলালিপি পাঠ করিলে জানা যায় যে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যের শিল্পীরা ইষ্টক এবং কাষ্ঠ দ্বারাই মন্দির নির্ম্মাণ করিতেন, তখনও স্থাপত্যের জন্য প্রস্তর ব্যবহারের রীতি প্রচলিত হয় নাই। সম্ভবতঃ এজন্যই দাক্ষিণাত্যে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কালের মন্দির এখন দেখিতে পাওয়া যায় না। সপ্তম শতাব্দীতে পল্লব রাজ্যে শিল্পের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। পাথর

খুদিয়া মামল্লপুরমের বিশাল মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। পল্লবগণের রাজধানী কাঞ্চী হিন্দু-সভ্যতার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং এখানে বহু মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। পল্লব-শিল্পের রীতি অষ্টম শতাব্দীতে চালুক্য রাজ্যে অনুসৃত হইয়াছিল। ইলোরা গুহায় যে সমুদয় প্রসিদ্ধ চিত্র অঙ্কিত আছে তাহা চালুক্যযুগের কীর্ত্তি। চালুক্য বংশের পতনের পর দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূট-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই যুগে ইলোরাতে পাহাড় খুদিয়া যে কৈলাসনাথ মন্দির নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল তাহার তুলনা পাওয়া কঠিন। বোম্বাই শহরের নিকটবর্ত্তী এলিফেণ্টা দ্বীপে পাথর খুদিয়া শিবের একটি প্রকাণ্ড মূর্ত্তি গঠন করা হইয়াছিল; ইহা সাধারণতঃ ত্রিমূর্ত্তি নামে পরিচিত।

পরবর্ত্তী কালে তাঞ্জোর, মাদুরা প্রভৃতি স্থানে যে সকল সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহাদের শিল্প-চাতুর্য্য ও গঠনপদ্ধতি উত্তর ভারতের শিল্পীদের অনুসৃত রীতি হইতে অনেকাংশে পৃথক। এই মন্দিরগুলির চারিপাশে বিরাট আঙ্গিনা; আঙ্গিনাটি উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। চারিদিকে 'গোপুরম্' নামে পরিচিত চারিটি তোরণ। গোপুরমের গাত্রে বহু দেব-দেবীর মূর্ত্তি খোদিত থাকে। মন্দিরগুলির বিরাট আকার ও সূক্ষ্ম কারুকার্য্য দর্শকের মনে বিস্ময়ের উৎপাদন করে। চোলরাজগণ মাদুরায় মীনাক্ষীদেবীর বিশাল মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার উত্তর বাহু ৮৩৪ ফুট, দক্ষিণ বাহু ৮৫২ ফুট, পূর্ব্ব বাহু ৭২০ ফুট এবং পশ্চিম বাহু ৭২৯ ফুট দীর্ঘ। বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত স্তম্ভশ্রেণীর উপর ছাদ বিন্যস্ত রহিয়াছে। ছাদে ও প্রাচীরে বহু দেব-দেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত। মীনাক্ষীর বিবাহের চিত্রটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দাক্ষিণাত্যের সুপ্রাচীন দ্রাবিড়-সভ্যতা যে আর্য্য-সভ্যতার সহিত দীর্ঘকালব্যাপী সংঘর্ষে একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া যায় নাই,

বরঞ্চ আর্য্যদের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি গ্রহণ করিয়া তাহাকে নূতন রূপ দান করিয়াছে, দাক্ষিণাত্যের এই বিশাল মন্দিরগুলিতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

উড়িষ্যায় অষ্টম শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বহু সুবৃহৎ এবং সুদৃশ্য মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ভুবনেশ্বর, কোনারক এবং পুরীর মন্দিরগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ কোন সমালোচক বলিয়াছেন, "এগুলির গঠন-সৌকুমার্য্য ও গাম্ভীর্য্যের কথা বর্ণনার দ্বারা বোঝানো যায় না, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিবার ও অনুভব করিবার জিনিস।" এই মন্দিরগুলির ভাস্কর্য্য-কলাও অপূর্ব্ব। পুরীর একটি মাতৃমূর্ত্তি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। কোনারকের সূর্য্য-মন্দিরে যে সকল মূর্ত্তি আছে তাহাদের পরিকল্পনা ও গঠন-কৌশল অনিন্দ্য। "মোটামুটি মন্দিরটিতে যেন কী এক ঐশী শক্তির তেজ ফুটাইবার জন্য শিল্পীরা ইহাকে ভাস্কর্য্য-সম্পদে অলঙ্কৃত করিয়াছেন!" ভুবনেশ্বরে হরিণ প্রভৃতি বিভিন্ন জন্তুর চিত্র আছে; কোনারকে বিরাট হস্তী ও অশ্বের মূর্ত্তি আছে। উড়িষ্যার শিল্পীদের দৃষ্টি কেবল দেবতা ও মানুষেই সীমাবদ্ধ ছিল না। জীব-জন্তুর চিত্রও তাঁহারা অতিশয় নিপুণতার সহিত রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশে প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শনের মধ্যে গৌড়, পাহাড়পুর এবং বাণগড়ের ধ্বংসাবশেষ উল্লেখযোগ্য। সুপ্রাচীন কাল হইতে বাঙ্গালার শিল্পে ও চিত্রকলায় একটা বিশেষত্ব ছিল। ভারতীয় শিল্পকলায় ও চিত্রবিদ্যায় যে লক্ষণগুলি দেখা যায় সেই রীতি বাঙ্গালার শিল্পে ও চিত্রে অন্ধভাবে অনুসৃত হয় নাই। বাঙ্গালী শিল্পিগণ অভিনব প্রণালীতে বুদ্ধমূর্ত্তি ও দেবমূর্ত্তি গঠন করিয়াছে—পূজার চণ্ডীমণ্ডপ

সজ্জায় ও দেব-দেবীর চিত্র অঙ্কনে তাহারা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের শিল্পরীতির অন্ধ অনুকরণ করে নাই। পাল ও সেনরাজগণের সময়ে বাঙ্গালার শিল্প বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল এবং ইহার প্রভাব নেপাল, তিব্বত, ব্রহ্মদেশ, সুমাত্রা এবং যাভা পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। পালরাজগণের সময়ে ধীমান্ এবং বীতপাল নামক দুইজন প্রতিভাবান্ শিল্পী একটি নূতন ভাস্কর্য্য-রীতির প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই রীতিতে প্রস্তুত কতকগুলি সুদৃশ্য বৌদ্ধ ও হিন্দু দেব-মূর্ত্তি পূর্ব্ব ভারতের নানা স্থানে পাওয়া গিয়াছে। পালবংশীয় সম্রাট্ ধর্ম্মপাল যে বিক্রমশিলা বিহার স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা ধীমান্ ও বীতপালের পরিকল্পনা অনুযায়ী নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল। কয়েকখানি প্রাচীন পুঁথিতে পালযুগের শিল্প-রীতি অনুসারে অঙ্কিত কতকগুলি উৎকৃষ্ট চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। পালরাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের আমলে শিল্পে বৌদ্ধ প্রভাব বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছিল। সেনরাজগণের সময়ে হিন্দু প্রভাবের পুনরাবির্ভাব হয়। তাঁহাদের শাসনকালে উত্তর বাঙ্গালায় শূলপাণি নামক একজন প্রসিদ্ধ শিল্পীর আবির্ভাব হইয়াছিল।

প্রাচীন গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান ইংরেজবাজাব শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় দশ মাইল দূরে পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ ইহার কয়েক মাইল উত্তরে কালিন্দী নদীর তীরে পালবংশীয় কোন কোন রাজার রাজধানী ছিল।

পাহাড়পুর বর্ত্তমান রাজসাহী জেলার অন্তর্গত। বহুদিন পর্য্যন্ত এই স্থানটি অরণ্য-সঙ্কুল এবং জনমানবশূন্য ছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের যত্নে এখানে খননকার্য্য আরম্ভ হয়। খননকার্য্য কিছুদূর অগ্রসর হইলে এখানে এক অপরূপ ধর্ম্মায়তন

আবিষ্কৃত হয়। গ্রাম্য শাস্তি ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলানিকেতনে বৌদ্ধভিক্ষুগণ যাহাতে সাধনভজনে নিমগ্ন থাকিতে পারেন, সম্ভবতঃ সেই উদ্দেশ্যেই এই নির্ম্মল ও উদার পরিবেশের মধ্যে এই মহাবিহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই অনুমান সত্য হইলে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, পাহাড়পুরের আবিষ্কৃত ধ্বংসাবশেষ একদা বৌদ্ধ-বাঙ্গালার সভ্যতার মর্ম্মকেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

পাহাড়পুর সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে সর্ব্বপ্রথমেই ইহার প্রধান স্তূপের অন্তর্গত মহাবিহারের উল্লেখ করিতে হয়। প্রথম দৃষ্টিতেই ইহার অপূর্ব্ব ও নয়নাভিরাম স্থাপত্যশিল্পের দিকে মন আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। এই মহাবিহারের গঠনরীতি প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পের এক অপরূপ নিদর্শন। যে পদ্ধতিতে এই বিশাল হর্ম্ম্য গঠিত হইয়াছে, তাহা সমগ্র ভারতে অতুলনীয়। ব্রহ্ম, কাম্বোডিয়া ও যবদ্বীপের কতিপয় মন্দিরের গঠনরীতির সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য আছে। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে সুদূর অতীতে পূর্ব্ব এশিয়ায় ও ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় সভ্যতা-বিস্তারে বাঙ্গালার দান নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নহে। যাহা হউক, পাহাড়পুরে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের যে মহাবিহার ছিল তাহার ন্যায় প্রকাণ্ড সঙ্ঘারাম ভারতের অন্য কোন স্থানে নির্ম্মিত হয় নাই। প্রধান মন্দিরটি ঘিরিয়া উহার বিরাট সমচতুর্ভুজ সঙ্ঘাবাসটি প্রতিষ্ঠিত ; ইহার প্রতিটি ভুজ ৮২২ ফুট দীর্ঘ। এই মহাবিহারে সারি সারি চতুর্ভুজে ১৮৯টি কুঠরী ও প্রবেশমুখে একটি বৃহৎ অট্টালিকা আছে। এই কুঠরীগুলিতে ৯২টি উচ্চ পূজার বেদী দেখিতে পাওয়া যায়।

পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত ধ্বংসাবশেষে যদিও প্রাক্-পালযুগের সামান্য চিহ্নাদি পাওয়া গিয়াছে, তবুও একথা নির্ভয়ে বলা চলে যে, ইহার মহাবিহার সঙ্ঘারাম খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে পালযুগেই নির্ম্মিত

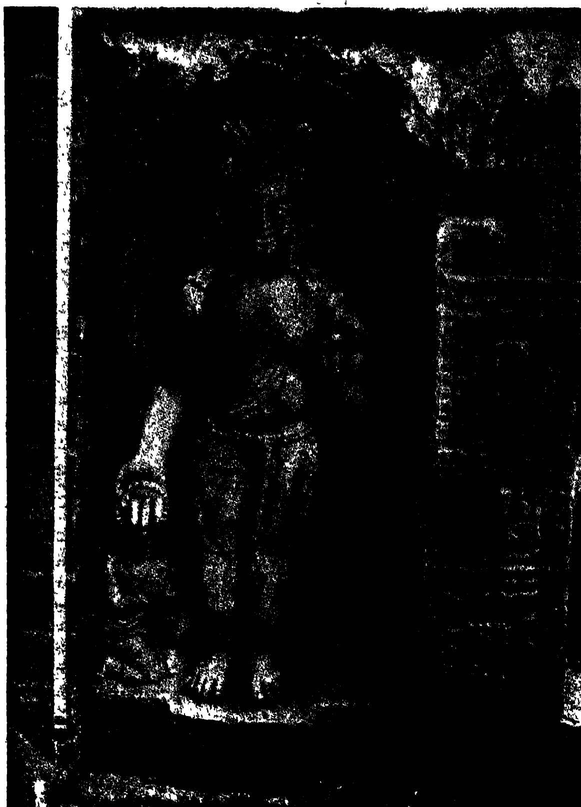
হইয়াছিল। এই মহাবিহারের প্রস্তরগাত্রে উৎকীর্ণ মূর্ত্তি ও শিলালিপির অপূর্ব্ব চাতুর্য্য এবং গঠনরীতির শিল্পনিপুণতা দেখিয়া মনে হয়, একদা বঙ্গীয় ভাস্কর্য্য শিল্প যে অপ্রত্যাশিত উন্নতিলাভ করিয়াছিল, পাহাড়পুরে মহাবিহারের পাদদেশে প্রস্তরগাত্রে খোদিত ৬৩টি মূর্ত্তি তাহার অনুপম চিহ্নস্বরূপ।

পাহাড়পুরে প্রাপ্ত আরও কয়েকটি দ্রব্যে যেরূপ নিপুণ শিল্প-কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে এযুগেও আমাদের অনেক সময় বিস্মিত হইতে হয়। এস্থানের নক্সা করা টালি, মানুষ, জীবজন্তুর ছবি এবং 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'হিতোপদেশে' বর্ণিত কাহিনীর চিত্রাদি আমাদের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত আরও দৃঢ়তর করে মাত্র।

পাহাড়পুরের মন্দিরের ভিত্তিমূল খনন করিয়া যে সকল অমূল্য দ্রব্যাদি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে পুরাণে বর্ণিত 'গিরি-গোবর্দ্ধন ধারণ', শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক 'ধেনুকাসুর বধ' প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি গঠন সৌন্দর্য্যের দিক হইতে অতি সূক্ষ্ম কলাকুশলতার পরিচায়ক। এতদ্ভিন্ন রামায়ণে বর্ণিত যে কয়েকটি চিত্র এখানে উৎকীর্ণ আছে তাহাতেও আমরা প্রথম শ্রেণীর সূক্ষ্ম শিল্পকুশলতার পরিচয় পাই। এখানে মন্দিরগাত্রে দগ্ধ মৃত্তিকা-নির্ম্মিত যে সমস্ত জীবজন্তুর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে (যথা, মৎস্য, শুশুক, কুমীর, সাপ, শঙ্খ, ঝিনুক প্রভৃতি) তাহা বাঙ্গালীর নিকট চির-পরিচিত ও বাঙ্গালী জীবনের দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্ম্মের সহিত অচ্ছেদ্যবন্ধনে বিজড়িত। ইহাতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, পাহাড়পুরের সঙ্ঘারাম বিহারাদির মত বিপুল আয়তনের অট্টালিকাসমূহ বাঙ্গালী স্থপতি ও ভাস্করের নিপুণ হস্তেরই কালজয়ী কীর্ত্তি।

এই মহাবিহারকে কেবলমাত্র প্রাচীন বাংলার ভাস্কর্য্য শিল্পের নিদর্শন হিসাবে বিচার করিলে ভুল করিব। এই মহাবিহার

সমসাময়িককালে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র ছিল; খৃষ্টীয় নবম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই স্থান তিব্বতীয়দের অন্যতম



বৃহস্পতি মূর্ত্তি—পাহাড়পুর

প্রধান তীর্থক্ষেত্র ছিল। যে সঙ্ঘারাম মহাবিহারে মহাপণ্ডিত শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর অতীশের মত ত্রিকালদর্শী মনীষী বহু বৎসর বাস করিয়াছিলেন,

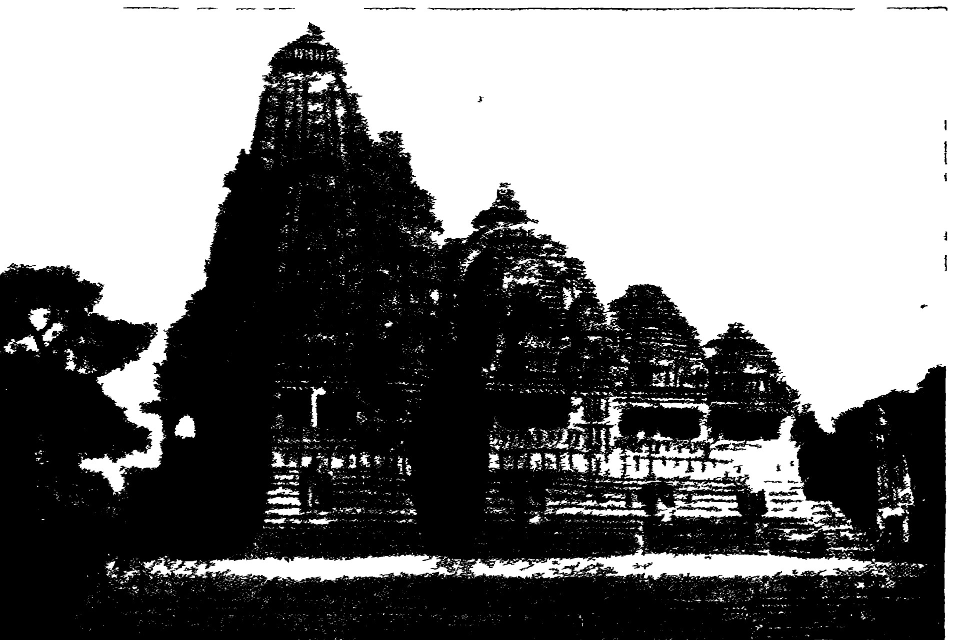
যেখানে তাঁহার গুরুদেব মহাস্থবির রত্নাকর শান্তি অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেস্থান যে অচিরকাল মধ্যে সমগ্র ভারতের সমাদর লাভ করিয়া তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছিল, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি !

প্রাচীন বাঙ্গালার অন্যতম গৌরবস্থল বাণগড় দিনাজপুর সহরের প্রায় ১৭ মাইল দক্ষিণে পুনর্ভবা নদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। এখানে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বহু মৃত্তিকার স্তূপ এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বহু ইষ্টক ও প্রস্তর স্থানটির প্রাচীনতা নির্দ্দেশ করিতেছে। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে এখানে খননকার্য্য চলিতেছে। খননকার্য্য আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বেই এখানে বহু ঐতিহাসিক মাল-মশলা পাওয়া গিয়াছে।। এই সকল সামগ্রীর মধ্যে পালবংশীয় নৃপতি প্রথম মহীপালদেবের তাম্রশাসন, কম্বোজবংশীয় জনৈক রাজার একটি স্তম্ভলিপি, তৃতীয় গোপালদেবের রাজ্যকালের একখানি সদাশিব মূর্ত্তি এবং অন্যান্য বহু প্রস্তরস্তম্ভ ও মূর্ত্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল স্তূপ, ইষ্টক, প্রস্তর ও মূল্যবান ঐতিহাসিক মাল-মশলাগুলি হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে বাণগড় অতীতে একটি অত্যন্ত বর্দ্ধিষ্ণু জনপদ ছিল। কিম্বদন্তী আছে যে বাণগড় পুরাণোক্ত দৈত্যরাজ বাণের রাজধানী ছিল। কোনও কোনও প্রাচীন পুস্তকে এইস্থান বাণপুর নামেও উল্লিখিত আছে। বাণরাজকন্যা উষার নামানুসারে ইহা উষাবন নামেও পরিচিত ছিল। মহীপালদেবের তাম্রশাসন পাঠে জানিতে পারা যায় তৎকালে এই স্থানের নাম ছিল 'কোটীবর্ষ'। জৈন ধর্ম্মগ্রন্থাদিতে কোটীবর্ষ জৈন ধর্ম্মের একটি বিখ্যাত কেন্দ্ররূপে উল্লিখিত আছে। বহু প্রাচীন কাল হইতে পাল সাম্রাজ্যের পতনকাল পর্য্যন্ত এইস্থান সম্ভবতঃ কোটীবর্ষ নামেই খ্যাত ছিল। গুপ্ত সম্রাট্‌গণের রাজত্বকালে বহুদিন ব্যাপিয়া ইহা পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি বা উত্তরবঙ্গীয় রাজনৈতিক বিভাগের একটি

বিষয় বা উপবিভাগের কেন্দ্র ও বর্ত্তমান জেলা শহরের সমমর্য্যাদাসম্পন্ন ছিল। তৎকালীন তাম্রশাসনাদি হইতে কোটীবর্ষের কয়েকজন শাসনকর্ত্তা ও কতিপয় গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম জানিতে পারা যায়। পরবর্ত্তী কালের বহু গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমান আক্রমণ-কালে সম্ভবতঃ এই স্থান দেবীকোট নামে খ্যাত ছিল। মুসলমান অধিকারের পরও বহুদিন পর্য্যন্ত এই স্থান জনপরিপূর্ণ, বর্দ্ধিষ্ণু ও সামরিক দিক হইতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পরে কোনও এক সময়ে ইহা পরিত্যক্ত হইয়া ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল।

বাণগড়ের খনন কার্য্য বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। কয়েক সহস্র বর্গগজ জমির আবরণ উন্মোচিত হইয়া নিম্নদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত বেশ খানিকটা স্থান অতীতের বহু বিচিত্র দ্রব্যসম্ভার লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এখানে যে সকল পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কতিপয় গৃহের প্রাচীর ও ভিত্তিমূল, একটি বিচিত্ররূপে সংস্থাপিত ও মধ্যে পদ্মাকৃতি কুণ্ড সম্বলিত গৃহ, আবরণযুক্ত জলপ্রণালী ইত্যাদি প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন, প্রাচীন মুদ্রা, পোড়ামাটির লেখ-মুদ্রা, পোড়া মাটির মূর্ত্তি ও পুতুল, কয়েক টুকরা সোনার মাদুলী, কতিপয় মৃত্তিকানির্ম্মিত প্রাত্যহিক ব্যবহারের বাসন ও মসীভাণ্ড ও বহু বিচিত্র প্রস্তরের মূর্ত্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আশা করা যায় যে অদূর ভবিষ্যতে বাণগড়ে প্রাপ্ত মাল-মশলার উপর নির্ভর করিয়া ঐতিহাসিকগণ বাঙ্গালার লুপ্তপ্রায় প্রাচীন সভ্যতার এক অতি মূল্যবান্ অধ্যায় রচনা করিতে পারিবেন।

উত্তর ভারতে বুন্দেলখন্দ, রাজপুতানা ও গুজরাটেও স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য শিল্পের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। বুন্দেলখন্দে চন্দেলবংশীয় রাজপুত রাজগণ রাজত্ব করিতেন। তাঁহারা বহু মন্দির নির্ম্মাণ



খজুরাহোর মন্দির

করাইয়াছিলেন। খজুরাহোর প্রসিদ্ধ মন্দির চন্দেল্ল শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। উড়িষ্যার ভাস্কর্য্যের সহিত খজুরাহোর ভাস্কর্য্যের বেশ মিল আছে। "সমস্ত মন্দিরগুলির গায়ে ছোট বড় ভাস্কর্য্যে ভরা। কোথাও গীতবাদ্য চলিয়াছে, কোথাও সংকীর্ত্তন হইতেছে, কোথাও বিষ্ণু, নারদ, গণেশ প্রভৃতি উৎকীর্ণ আছে। যেন একটা জীবন্ত গতিবেগ সচল হইয়া মন্দিরগুলির গায়ে স্তব্ধ হইয়াছে।" * রাজপুতানায় ও গুজরাটে জৈন ধর্ম্ম বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আবু পর্ব্বতের জৈন মন্দিরটি ভারতীয় স্থাপত্য-কলার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। গুজরাটের অন্তর্গত গিরনারের মন্দিরগুলিও উল্লেখযোগ্য।

প্রাচীনতম কাল হইতে আরম্ভ করিয়া হিন্দু যুগের অবসান পর্য্যন্ত ভারতীয় শিল্পের বিবর্ত্তনের যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমরা করিলাম তাহাতে দেখা যায় যে ধর্ম্মই এদেশে শিল্পের প্রাণ। দেব-মূর্ত্তি এবং দেব মন্দির নির্ম্মাণের জন্যই হিন্দু শিল্পী আপনার প্রতিভা উৎসর্গ করিতেন,—হিন্দু সম্রাট্‌গণ আপনাদের কোষাগার উন্মুক্ত করিয়া দিতেন। দেব-সেবায় মানুষের মনে যেমন একাগ্রতার উৎপত্তি হয় অন্য বিষয়ে তেমন হয় না। ভারতীয় শিল্পে এই একাগ্রতার চিহ্ন বিশেষভাবে পরিস্ফুট। আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে ভারতীয় শিল্প বিদেশীর নিকট বারবার ঋণস্বীকার করিয়াছে, কিন্তু কখনও নিজের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দেয় নাই। বৈদেশিক শিল্পের ভাব ও গঠন-রীতি আত্মসাৎ করিয়া ভারতীয় প্রতিভা তাহাকে নূতন রূপ, নূতন মাধুর্য্য দান করিয়াছে। ইহা ভারতীয় শিল্পের বিশিষ্টতা এবং ভারতীয় শিল্পের অপূর্ব্ব কৃতিত্বের পরিচায়ক।

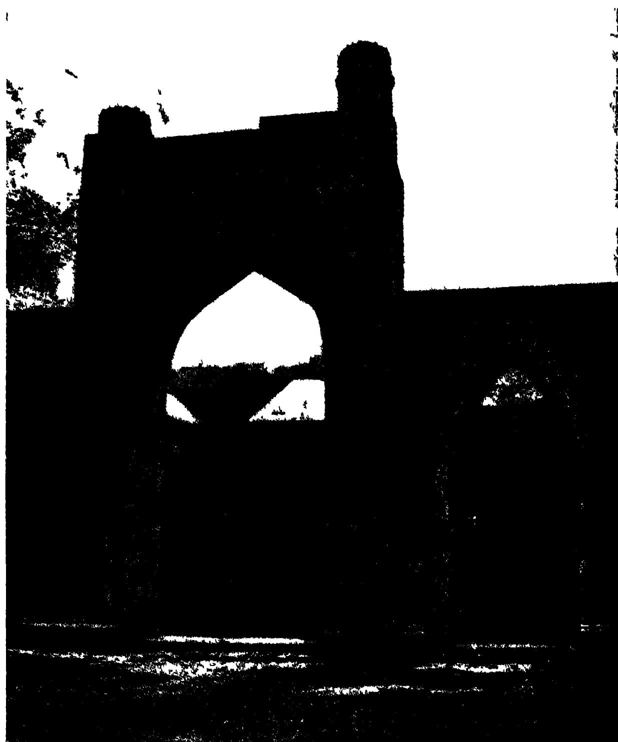
---

* শ্রীঅসিতকুমার হালদার প্রণীত 'ভারতের শিল্প-কথা', ১১৯ পৃষ্ঠা।

মুসলমান যুগে ভারতীয় শিল্প নূতন ভাবধারা ও গঠনরীতি আয়ত্ত করিয়া সমৃদ্ধ হইয়াছিল। মুসলমান রাজগণ প্রাসাদ ও ভজনালয় নির্ম্মাণের জন্য হিন্দু শিল্পিগণকেই নিয়োগ করিতেন, তাহারাও প্রাচীন হিন্দু-রীতি যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করিত। হিন্দু মন্দিরের ভগ্নাবশিষ্ট উপাদান অনেক সময় মস্‌জিদ নির্ম্মাণের জন্য ব্যবহৃত হইত। সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া মন্দিরকে মস্‌জিদে পরিণত করা হইয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। এই সকল কারণে মুসলমান বিজয়ের পর বহুদিন পর্য্যন্ত মুসলমান শিল্প হিন্দুদের ভাবধারা ও গঠনরীতি দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। পরে পারশ্য দেশ হইতে আগত মুসলমান শিল্পিগণ ভারতীয় শিল্পে পারসিক ভাবধারা ও গঠনরীতি সংক্রামিত করিয়াছিল। মধ্য যুগের সাহিত্য ও সমাজের ইতিহাস যেমন হিন্দু ও মুসলমানের মিলনের ইতিহাস, মধ্য যুগের শিল্পের ইতিহাসও তেমনই হিন্দু ও মুসলমান শিল্পের সম্মিলনের ইতিহাস।

সুল্‌তান মাহ্‌মুদ হিন্দু শিল্পিগণের দক্ষতায় এত প্রীত হইয়াছিলেন যে তিনি বহু হিন্দু শিল্পীকে গজনীর শোভাবর্দ্ধনের জন্য নিজ রাজ্যে লইয়া গিয়াছিলেন। মহম্মদ ঘূরীর উত্তর ভারত বিজয়ের পর হইতেই দিল্লী ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে মুসলমানগণ প্রাসাদ ও মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করে। কুতবউদ্দীন দিল্লীতে একটি সুদৃশ্য মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন এবং কুতব মিনারের নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করেন। ইল্‌তুৎমিস আজমীরে একটি বৃহৎ মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন এবং কুতবমিনারের নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত করেন। এই স্তম্ভ প্রায় ২৪২ ফুট উচ্চ। বাগ্‌দাদ নিবাসী সাধু কুতবউদ্দীনের স্মৃতিরক্ষার্থ ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ভারতে মুসলমান প্রভুত্বের এই বিরাট কীর্ত্তিস্তম্ভ সাতশত বৎসর যাবৎ দিল্লীর প্রান্তরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে! দাস বংশের

আমলে নির্ম্মিত মস্‌জিদগুলি এবং কুতবমিনার হিন্দু শিল্পীদের দ্বারাই নির্ম্মিত হইয়াছিল।



ইল্‌তুৎমিসের মস্‌জিদ (আজমীর)

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আসাম ও কাশ্মীর ব্যতীত সমগ্র ভারতবর্ষ দিল্লী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়; ক্ষমতায় ও ঐশ্বর্য্যে দিল্লী

নগরী সমগ্র এশিয়ার মধ্যে অতুলনীয় হইয়া উঠে। আলাউদ্দীন খল্জী পৃথ্বীরাজের কেল্লার উত্তর-পূর্ব্বে 'সিরী' নামক এক নূতন শহর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত প্রস্তরনিম্মিত দুর্গ অত্যন্ত সুদৃঢ় ছিল। দুর্গের অভ্যন্তরে অবস্থিত সহস্র স্তম্ভবিশিষ্ট প্রাসাদ সৌন্দর্য্যে অতুলনীয় ছিল, কিন্তু এখন ইহার চিহ্নমাত্রও নাই। ঐতিহাসিক বরণী লিখিয়াছেন যে এই প্রাসাদের ভিত্তিতে সহস্র সহস্র মোগলের শির প্রোথিত হইয়াছিল। আলাউদ্দীনের নিষ্ঠুরতার তুলনা নাই, কিন্তু শিল্পের ইতিহাসে তাঁহার নাম স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

মোগলদের আক্রমণ হইতে রাজৈশ্বর্য্য রক্ষা করিবার জন্য ঘিয়াসউদ্দীন তুঘ্লুক দিল্লীর উপকণ্ঠে 'তুঘ্লুকাবাদ' নামক এক নূতন শহর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এখনও এই শহরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ঘিয়াস্উদ্দীনের সমাধিমন্দির এখনও বর্ত্তমান আছে। ইহাতে সৌন্দর্য্য নাই, গাম্ভীর্য্য ও শক্তি আছে। মুহম্মদ তুঘ্লুক 'জহান্পনা' নামক নূতন এক শহর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এখানেও সহস্র স্তম্ভবিশিষ্ট একটি প্রাসাদ ছিল। ইব্ন্ বতূতার গ্রন্থে এই প্রাসাদের বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। ফীরূজ তুঘ্লুক বহু সুদৃশ্য মস্জিদ, প্রাসাদ এবং উদ্যান নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। দিল্লীর উপকণ্ঠে তিনি 'ফীরূজাবাদ' নামক একটি নূতন শহর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। বিখ্যাত জৌনপুর শহরও তিনিই স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন সুল্তান শিল্পের প্রতি এত অনুরাগ প্রদর্শন করেন নাই।

তৈমুরলঙ্গও সুল্তান মাহ্মুদের ন্যায় বহু ভারতীয় শিল্পীকে নিজের রাজ্যে লইয়া গিয়াছিলেন। সমরকন্দের প্রসিদ্ধ জাম-ই-মস্জিদের নির্ম্মাণ কার্য্যে তাহারা অংশগ্রহণ করিয়াছিল। তৈমুরলঙ্গের প্রস্থানের পর দিল্লী সাম্রাজ্য নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইল। শিল্পোন্নতির জন্য যে

শান্তি ও অর্থ আবশ্যক, পঞ্চদশ শতাব্দীর সুলতানগণের তাহা ছিল না। লোদীবংশীয় সুলতানগণ যে সকল মস্জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহা সৌন্দর্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ নহে। সিকন্দর লোদী আগ্রা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা, কিন্তু মুঘল আমলেই আগ্রা শোভায় ও ঐশ্বর্য্যে ভারতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল।

তুঘ্লুক বংশের শাসনকালে দিল্লী সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, বিভিন্ন প্রদেশে স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হইতে থাকে। এই সকল প্রাদেশিক রাজ্যের অধিপতিগণ শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। প্রায় প্রত্যেক প্রদেশের একটি নিজস্ব শিল্প-রীতি ছিল; প্রাদেশিক শিল্পিগণ দিল্লীর শিল্পের অন্ধ অনুকরণ করিয়া নিজেদের প্রতিভা খর্ব্ব করেন নাই। দিল্লীর শিল্পে খাঁটি মুসলমান আদর্শ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু প্রাদেশিক রীতি সর্ব্বত্রই হিন্দুভাবাপন্ন।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের কিয়দংশ এক স্বাধীন মুসলমান রাজবংশের শাসনাধীন হয়। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল জৌনপুর। সুলতান ফীরূজ তুঘ্লুক এই শহরের প্রতিষ্ঠাতা। জৌনপুরের স্থাপত্য শিল্প বিশেষ প্রসিদ্ধ। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে নির্ম্মিত অটল মস্জিদ ভারতীয় শিল্পের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। জৌনপুরের সুলতানেরা বহু মস্জিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই বিধ্বস্ত হিন্দু মন্দিরের উপাদান দ্বারা হিন্দু শিল্পী কর্ত্তৃক গঠিত হইয়াছিল। এই সকল মস্জিদে হিন্দু ভাবধারা এবং গঠনরীতির প্রভাব অতি সুস্পষ্ট।

বাঙ্গালার তুর্কী ও আফ্গান শাসকগণ গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় বাস করিতেন। সেন রাজগণের আমলেও গৌড় বাঙ্গালার রাজধানী ছিল, কিন্তু এখানে হিন্দু যুগের স্থাপত্যের সমুদয় চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছে।

রাজা লক্ষ্মণসেন গৌড়ের নাম রাখিয়াছিলেন 'লক্ষ্মণাবতী', তাই মুসলমানগণের লিখিত ইতিহাসে ইহা 'লক্ষ্ণৌতী' নামে পরিচিত। প্রাচীন গঙ্গা এবং মহানন্দা নদীর সঙ্গমস্থলে গৌড় অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমান মালদহ জেলার প্রধান শহর ইংরেজবাজার ইহার অনতিদূরে



অটল মস্‌জিদ (জৌনপুর)

অবস্থিত। বঙ্গদেশ যতদিন দিল্লীর সুল্‌তানগণের অধীন ছিল ততদিন গৌড় রাজপ্রতিনিধিদের বাসস্থান ছিল। ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে সাম্‌স্‌উদ্দীন ইলিয়াস শাহ্‌ দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করিয়া বাঙ্গালায় এক স্বাধীন মুসলমান রাজ্য স্থাপন করেন। এই সময়ে পাণ্ডুয়া বা ফীরুজাবাদ বাঙ্গালার রাজধানী হইল। বর্ত্তমান ইংরেজবাজার

হইতে ১১ মাইল এবং গৌড় হইতে ২০ মাইল দূরে এই শহর অবস্থিত ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজধানী পুনরায় গৌড়ে স্থানান্তরিত হয়। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে সুল্‌তান সুলেমান কররাণী গৌড় পরিত্যাগ করেন। গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তনের ফলে গৌড় ও পাণ্ডুয়া ক্রমশঃ অস্বাস্থ্যকর স্থানে পরিণত হইয়াছিল।

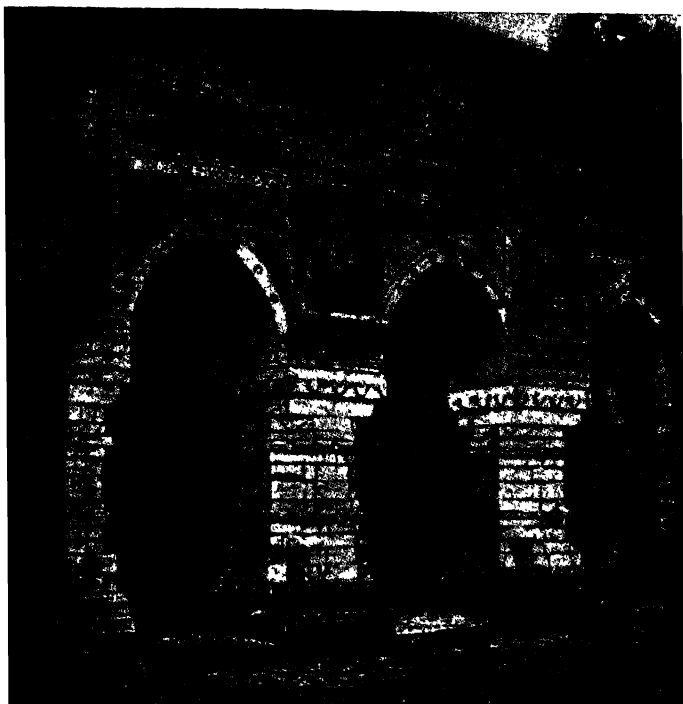
গৌড় দৈর্ঘ্যে ১২॥০ মাইল এবং প্রস্থে ২ মাইল ব্যাপিয়া অবস্থিত ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে একজন পর্ত্তুগীজ লেখক লিখিয়াছিলেন যে গৌড়ের লোকসংখ্যা ১২ লক্ষ। সমগ্র শহর মৃত্তিকানির্ম্মিত এক বিশাল প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল। এই প্রাচীরের উপরিভাগে বহু প্রাসাদ ও গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল।



বড় সোনা মস্‌জিদ (গৌড়)

গৌড়ের প্রাচীন কীর্ত্তির মধ্যে বড় সোনা মস্‌জিদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে সুল্‌তান নস্‌রৎ শাহ্‌ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। গৌড়ে এরূপ সুবৃহৎ হর্ম্ম্য আর ছিল না। এই মস্‌জিদ সাধারণের নিকট 'বারদ্বারী' নামে পরিচিত। 'দাখিল দরজা' বা দুর্গের প্রধান প্রবেশদ্বার আর একটি উল্লেখযোগ্য কীর্ত্তি। গৌড়ে ফীরূজ মিনার নামক একটি উচ্চ ও সুদৃশ্য স্তম্ভ আছে; কোন্‌ সুল্‌তান উহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহা সঠিকভাবে জানা যায় না। 'কদম রসুল' নামক

একটি মস্‌জিদও সুল্‌তান নস্‌রৎ শাহের কীর্ত্তি। গৌড়ে আরও বহু মস্‌জিদ ছিল। সুল্‌তানগণ বহু জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কয়েকটির চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান আছে।



কদম রসুল (গৌড়)

পাণ্ডুয়া শহরও গৌড়ের ন্যায় হিন্দু আমলে স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু এখানেও হিন্দু স্থাপত্যের সমুদয় নিদর্শন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। শাহ্‌ জালাল এবং নূর কুতব-উল-আলম নামক দুইজন বিখ্যাত

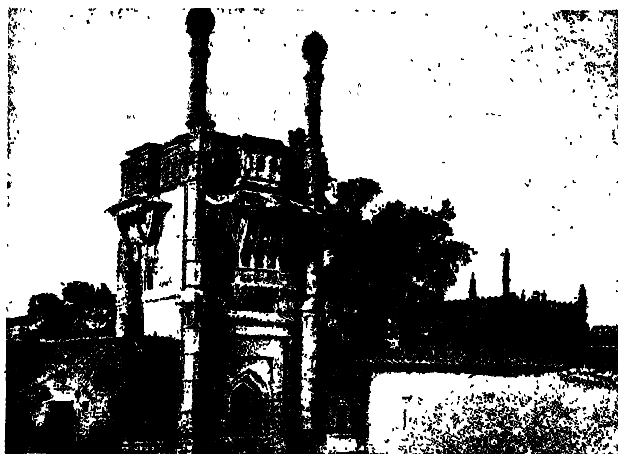
মুসলমান সাধু পাণ্ডুয়ায় বাস করিতেন। শাহ্ জালালের দরগা এখনও বর্ত্তমান আছে। এই দরগা সম্ভবতঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্ম্মিত হইয়াছিল। নূর কুতব-উল-আলমের যে সমাধি-মন্দির এখন পাণ্ডুয়ায় দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বোধ হয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে



আদীনা মস্‌জিদ (পাণ্ডুয়া)

নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনিই রাজা গণেশের পুত্র যদুকে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। পাণ্ডুয়ার মস্‌জিদগুলির মধ্যে সুল্‌তান সিকন্দর শাহ্ কর্ত্তৃক চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্ম্মিত আদীনা মস্‌জিদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সে যুগের মুসলমান শিল্পের ইহা একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। পাণ্ডুয়ায় সুল্‌তানগণের প্রাসাদ একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

গুজরাটেই প্রাদেশিক শিল্প পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। গুজরাটের স্থলতানেরা যে সকল প্রাসাদ ও মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন তাহা সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। আহম্মদাবাদ এবং চম্পানীর গুজরাটী স্থাপত্য শিল্পের কেন্দ্র। গুজরাটের মুসলমান শিল্পীরা পূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দু আমলের প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিতে পারে নাই।

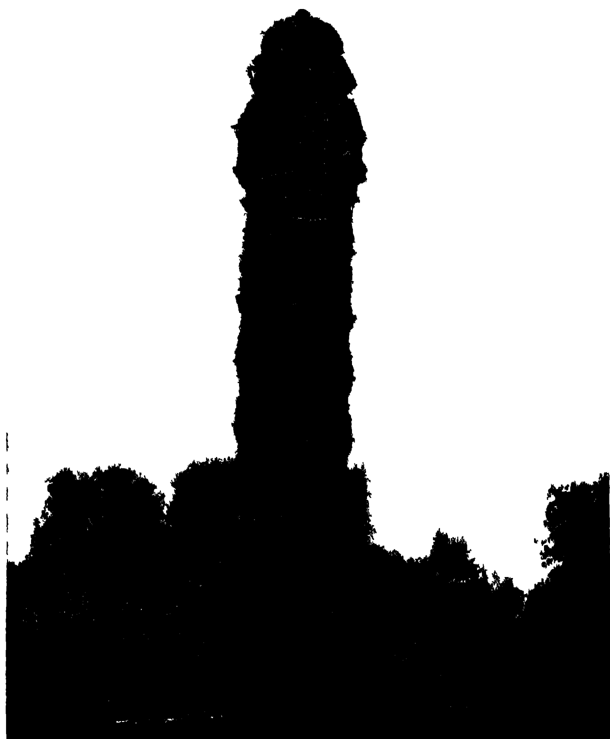


বিজাপুরের একটি প্রাসাদ

মালবের স্বাধীন মুসলমান রাজগণও শিল্পের উৎকর্ষ সাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন। মাণ্ডু শহরে নির্ম্মিত প্রাসাদ ও মস্‌জিদগুলিতে হিন্দু প্রভাবের চিহ্ন অস্পষ্ট; এখানে দিল্লীর ন্যায় খাঁটি মুসলমানী রীতিই অনুসৃত হইয়াছিল। 'হিন্দোলা মহল' এবং 'জাহাজ মহল' নামক দুইটি প্রাসাদ শিল্প-সৌন্দর্য্যে অননুকরণীয়।

দাক্ষিণাত্যে মুসলমান শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বিজাপুরে পাওয়া যায়। বাহ্‌মনী বংশের রাজত্বকালে বহু দুর্গ এবং কয়েকটি শহর নির্ম্মিত

হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইহাদের গঠনরীতি এবং কারুকার্য্য বিশেষ প্রশংসনীয় নহে। বিজাপুরের সুল্‌তানগণ বহু মস্‌জিদ ও প্রাসাদ নির্ম্মাণ



রাণা কুম্ভের জয়স্তম্ভ (চিতোর)

করাইয়াছিলেন। শিল্প-সৌন্দর্য্যের দিক হইতে বিচার করিলে দিল্লী ব্যতীত উত্তর ভারতের অন্য কোন স্থানে ইহাদের তুলনা পাওয়া যায় না।

মুসলমান যুগেও রাজপুতানায় এবং দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত বিজয়নগর রাজ্যে হিন্দু স্থাপত্য বাঁচিয়া ছিল। মেবারের রাণা কুম্ভ মালব ও গুজরাটের মুসলমান সুল্‌তানগণকে পরাজিত করিয়া চিতোরে যে কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন তাহা কুতব মিনারের সহিত তুলনীয়। রাজপুতানার নানাস্থানে মুসলমান যুগে বহু মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। এগুলি আকারে তেমন বৃহৎ না হইলেও ইহাদের গঠন-কৌশল এবং সৌন্দর্য্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। গোয়ালিয়রের রাজপ্রাসাদের সৌন্দয্য বাবুরের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল।

বৈদেশিক পর্য্যটকগণের লিখিত বিবরণে বিজয়নগর শহরের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। একজন ইটালীয় পর্য্যটক বলিয়াছেন যে এই শহরের পরিধি ছিল ষাট মাইল এবং ইহার প্রাচীরের উচ্চতা ছিল পর্ব্বতপ্রমাণ। একজন মুসলমান পর্য্যটক বলিয়াছেন, "সমগ্র পৃথিবীতে যে এমন শহর আছে তাহা কোন মানুষ কখনও দেখে নাই এবং শোনে নাই। ইহা সাতটি সুরক্ষিত প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত।" বিজয়নগরের রাজগণ বহু সুদৃশ্য মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে তলিকোটের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া দাক্ষিণাত্যের মুসলমান সুল্‌তানগণ বিজয়নগর শহর বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। এখনও হাম্পী নামক স্থানে ইহার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে মুঘল যুগ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে মুঘল সম্রাট্‌গণের অতুলনীয় ঐশ্বর্য্য এবং শিল্প-প্রীতি অনুকূল ক্ষেত্র প্রস্তুত করিল, ভারতীয় শিল্পীর প্রতিভা পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ পাইল। মুসলমান শিল্প দীর্ঘকাল যাবৎ যে সাধনায় ব্যাপৃত ছিল তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিল।

বাবুর এবং হুমায়ুন রাজনৈতিক গোলযোগের জন্য কোন উল্লেখযোগ্য অট্টালিকা নির্ম্মাণের সুযোগ পান নাই, কিন্তু শের শাহের অল্পদিন স্থায়ী রাজত্বকাল শিল্পের ইতিহাসে অমর হইয়া রহিয়াছে। বিহারের অন্তর্গত সাসারামে তাঁহার যে প্রসিদ্ধ সমাধি-মন্দির আছে তাহা আলিওয়াল খাঁ নামক এক পঞ্জাবী শিল্পী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সমাধি-মন্দির অপূর্ব্ব শিল্প-প্রতিভা ও কল্পনাশক্তির নিদর্শন। বাদশাহী সিংহাসন লাভ করিয়া শের শাহ্ দিল্লীতে 'পুরাণ কেল্লা' নামক দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি ইহার নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত করাইয়া যাইতে পারেন নাই। দিল্লীতে এখনও ইহার ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান আছে। এই দুর্গ যে অত্যন্ত সুদৃঢ় ছিল তাহা ইহার প্রাচীর পরীক্ষা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। ইহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায় তোরণের কারুকার্য্যে। এই দুর্গের অভ্যন্তরস্থ একটি মস্‌জিদের স্থাপত্য-কৌশল শিল্পরসিকগণের প্রশংসা লাভ করিয়াছে।

আকবরের রাজত্বকালেই মুঘল শিল্পের গৌরবময় যুগের সূত্রপাত হয়। পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে আফ্‌গান শক্তি বিধ্বস্ত হইল, ক্রমে মুঘল-প্রভুত্ব উত্তর ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হওয়ায় শিল্পীরা আবার নিশ্চিন্ত মনে সৌন্দর্য্য-সাধনায় ব্যাপৃত হইল। আকবরের রাজ্যলাভের পর কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার বিমাতা হাজী বেগম হুমায়ুনের সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মিরাক মীর্জ্জা ঘিয়াস নামক পারস্যদেশীয় এক শিল্পীর তত্ত্বাবধানে এই সমাধি-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহাতে পারস্য এবং মধ্য এশিয়ার ভাবধারা ও গঠনরীতির প্রভাব অতি সুস্পষ্ট।

আকবর আগ্রা, লাহোর এবং ফতেপুর সীক্রীতে তিনটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। আগ্রার প্রাসাদ-দুর্গের প্রাচীর প্রায় ৭০

ফুট উচ্চ ছিল। প্রাচীরের অভ্যন্তরে বাঙ্গালা এবং গুজরাটের শিল্পরীতি অনুসারে রক্তপ্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত প্রায় পাঁচ শত অট্টালিকা ছিল। লাহোরের প্রাসাদ-দুর্গও আকৃতি ও গঠনে অনুরূপ ছিল। শাহ্‌জাহানের সময়ে এই দুইটি প্রাসাদ-দুর্গের কোন কোন অংশ বিধ্বস্ত করিয়া নূতন অট্টালিকা নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। ফতেপুর সীক্রীতে আকবর একটি নূতন শহর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সম্রাটের



আকবরের সমাধি-মন্দির (সেকেন্দ্রা)

চেষ্টায় কয়েক বৎসরের মধ্যেই জনশূন্য পর্ব্বতে এক অপূর্ব্ব নগরী গড়িয়া উঠিয়াছিল। এখানেও প্রাচীরের অভ্যন্তরে বহু সুদৃশ্য অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল। অট্টালিকাগুলির মধ্যে 'জাম-ই-মস্‌জিদ' এবং 'যোধবাঈর প্রাসাদ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'দেওয়ান-ই-খাস' নামক অট্টালিকায় সম্রাট্ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন।

মুঘল যুগের মুসলমান শিল্পীদের নিকট যে হিন্দুরা ঋণী তাহার সুস্পষ্ট

পরিচয় বৃন্দাবনের মন্দিরগুলিতে পাওয়া যায়। বৃন্দাবনের গোবিন্দজীর প্রসিদ্ধ মন্দির ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখানে মুঘল প্রাসাদের গঠনরীতির অনুকরণ করা হইয়াছিল। রাজপুতানায় এবং মালবে হিন্দুরাজগণ যে সকল প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন তাহাতেও মুঘল প্রভাবের চিহ্ন দেখা যায়।



ইতিমাদ-উদ্দৌলার সমাধি-মন্দির (আগ্রা)

জাহাঙ্গীর প্রাসাদ নির্ম্মাণ অপেক্ষা উদ্যান নির্ম্মাণের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধি-মন্দির তাঁহার রাজত্বকালেই নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু ইহার পরিকল্পনা তিনি করিয়াছিলেন কি আকবর স্বয়ং করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। এই সমাধি-মন্দিরের কারুকার্য্য ও গঠনকৌশল অতি মনোরম। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালেই সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের তত্ত্বাবধানে আগ্রায়

তাঁহার পিতা ইতিমাদ-উদ্দৌলার সমাধি-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। সমগ্র অট্টালিকাটি শ্বেতপ্রস্তরে নির্ম্মিত এবং মুঘল দরবারের সৌন্দর্য্য-প্রিয়তার পরিচায়ক।

সম্রাট্ শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে মুঘল শিল্প চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল। তাঁহার নির্ম্মিত প্রায় সমুদয় অট্টালিকাই মর্ম্মর প্রস্তর



শাহ্‌জাহানের একটি প্রাসাদ (আগ্রা)

দ্বারা গঠিত। আগ্রায় এবং লাহোরে আকবর যে প্রাসাদ-দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন শাহ্‌জাহান তাহার কোন কোন অংশ বিধ্বস্ত করাইয়া নূতন অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। আগ্রা দুর্গেই এই পরিবর্ত্তন বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। 'দেওয়ান-ই-আম', 'দেওয়ান-ই-খাস', 'খাস মহল', 'শীষ মহল', 'মোতি মসজিদ' প্রভৃতি আগ্রা দুর্গের অভ্যন্তরস্থ অট্টালিকাসমূহ এখনও দর্শকের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করে। এ সকলই

শাহ্‌জাহানের কীর্ত্তি। দিল্লীতে তিনি 'শাহ্‌জাহানাবাদ' নামক একটি নূতন শহর স্থাপন করিয়াছিলেন। এখানে তিনি যে দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন তাহা ঠিক যমুনার তীরে অবস্থিত ছিল, কিন্তু এখন যমুনা দূরে সরিয়া গিয়াছে। দুর্গের অভ্যন্তরস্থ অট্টালিকাগুলির মধ্যে 'দেওয়ান-ই-আম' এবং 'দেওয়ান-ই-খাস' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দুর্গের নিকটেই প্রসিদ্ধ 'জাম-ই-মস্‌জিদ'।

শাহ্‌জাহানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি 'তাজমহল'। বহু ভারতীয় এবং বিদেশী শিল্পীর সম্মিলিত সাধনা এই "স্ফটিকে গঠিত দীর্ঘনিশ্বাসে" মূর্ত্তিলাভ করিয়াছে। সমসাময়িক লেখকগণের গ্রন্থে দেখা যায় যে সমরকন্দ, বোখারা, সিরাজ, বাগ্‌দাদ এবং কনষ্টান্টিনোপল হইতে সেকালের শ্রেষ্ঠ শিল্পিগণ ভারত-সম্রাটের আহ্বানে তাজমহল নির্ম্মাণের জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। গঠনকার্য্যের ভার মুসলমান শিল্পীদের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছিল, কিন্তু কারুকার্য্যের দায়িত্ব ছিল হিন্দু শিল্পীদের। সিরাজনিবাসী ওস্তাদ ঈশা তাজমহলের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন।

সম্রাট্ শাহ্‌জাহানকে সম্বোধন করিয়া রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ বিস্ময়ে বলিয়াছেন—

"হে সম্রাট্, তাই তব শঙ্কিত হৃদয়
চেয়েছিলো করিবারে সময়ের হৃদয় হরণ
সৌন্দর্য্যে ভুলায়ে।

* * *

তাই তব অশান্ত ক্রন্দনে
চিরমৌন জাল দিয়ে বেঁধে দিলে কঠিন বন্ধনে।

* * *

প্রেমের করুণ কোমলতা
ফুটিল তা'
সৌন্দর্য্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে।
হে সম্রাট্ কবি
এই তব হৃদয়ের ছবি,
এই তব নব মেঘদূত,
অপূর্ব্ব অদ্ভুত
ছন্দে গানে
উঠিয়াছে অলক্ষ্যের পানে"

* * *

শাহ্জাহানের রাজত্বকালে মুঘল চিত্রশিল্পেরও চরম উন্নতি হইয়াছিল। বাবুরের সময়েই মধ্য এশিয়ার চিত্রশিল্পের প্রভাব ভারতবর্ষে সংক্রামিত হইয়াছিল। জাহাঙ্গীরের সময়ে ভারতীয় চিত্রশিল্প অনুকরণের প্রবৃত্তি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিল। শাহ্জাহানের সময়ে মনুষ্য-চিত্র অঙ্কনের রীতি পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। মুঘল চিত্রকরগণ যুদ্ধ, মৃগয়া প্রভৃতি উত্তেজক দৃশ্যের চিত্র অঙ্কনে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। অজন্তার শিল্পিগণের সহিত মুঘল চিত্রকরগণের তুলনা প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচক বলিয়াছেন, "মোগল চিত্র চোখের সামনে ধ'রে, তা'র মধ্যের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিল্পের বিচার ক'রে, তবে সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা যায়। মোগল চিত্রে আমরা প্রধানতঃ বিলাস ও ক্রীড়ার ভাবই দেখ্‌তে পাই। কিন্তু সমস্ত বৌদ্ধ চিত্রই একটা আধ্যাত্মিক আবেশ ও শান্তির ভাবে মণ্ডিত! এমন কি যুদ্ধবিগ্রহের ছবিতে পর্য্যন্ত ধর্ম্মভাব প্রবেশ করেছে।······মোগল শিল্প বিলাসপ্রধান এবং বৌদ্ধ শিল্প শান্তিময়।······মোগল শিল্পীরা চিত্রের যে ভাব অতি চেষ্টা ও যত্নে

সূক্ষ্ম কারুকার্য্য দ্বারা ফুটিয়ে তোলেন, বৌদ্ধ শিল্পীরা সেটা দু'চারটে সরু-মোটা রেখার টানে অল্পায়াসে দেখিয়ে দিয়েছেন। চিত্রশিল্পীদের এরূপ



শাহ্‌জাহান (সমসাময়িক চিত্র(

রেখাঙ্কনের দক্ষতা মোগল কেন পৃথিবীর কোন দেশের শিল্পীদের ছিল কিনা সন্দেহ।"*

* শ্রীঅসিতকুমার হালদার প্রণীত 'অজন্তা', ২১-২২ পৃষ্ঠা।

মুঘল যুগে রাজপুতানায় চিত্রশিল্পের এক বিশিষ্ট রীতির উদ্ভব হইয়াছিল। এই রীতিতে মুসলমান প্রভাব সুস্পষ্ট, কিন্তু প্রাচীন



রাজপুত চিত্রের একটি নিদর্শন—বাজবাহাদুর ও রূপমতী

ভারতীয় ভাবধারাই ইহার প্রকৃত উৎস। সাধারণতঃ হিন্দু দেব-দেবীগণের লীলা-কাহিনীই রাজপুত চিত্রশিল্পের বিষয়বস্তু, কিন্তু সমসাময়িক ঘটনা

ও সামাজিক জীবনের চিত্রও রাজপুত শিল্পিগণ একেবারে অবহেলা করেন নাই।

সম্রাট্ ঔরংজীবের রাজত্বকালে আকস্মিকভাবে মুঘল শিল্পের অধঃপতন হয়। সম্রাট্ স্বয়ং শিল্পানুরাগী ছিলেন না। সাম্রাজ্যও ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে বহু মস্‌জিদ ও প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে সৌন্দর্য্য ও প্রাণের অভাব। বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান সভ্যতাও অন্তঃসার-শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল।

ভারতীয় শিল্পের ইতিহাস প্রায় ছয় সহস্র বৎসরের ইতিহাস। সংক্ষেপে এই বিরাট কাহিনীর মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করা একেবারেই অসম্ভব। কত বিভিন্ন জাতি এই মহাদেশের জনসমুদ্রে বিলীন হইয়া গিয়াছে, কত শিল্প-রীতি এখানে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে! এই সুদীর্ঘ ইতিহাসের কত অধ্যায় এখনও আমাদের অজ্ঞাত রহিয়াছে! তবু আমাদের গর্ব্বের বিষয় এই যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপিয়া কঠোর সাধনায় আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ শিল্পক্ষেত্রে যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা বিশ্ব-সভ্যতার ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করিয়াছে।

ভারতের বিজ্ঞান

অনেকেরই ধারণা যে বিজ্ঞানচর্চ্চা ভারতে অতি আধুনিক কালে আরম্ভ হইয়াছে এবং উহা পাশ্চাত্য প্রভাবের ফল। প্রাচীন ভারতের গৌরবময় ইতিহাস যাহাদের অজ্ঞাত তাহাদের মধ্যেই এ ধারণা বিশেষভাবে বদ্ধমূল। সুপ্রাচীন কাল হইতে ভারতীয়গণ বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য আবিষ্কারে ভারতীয় মনীষীদের দান অবহেলা করিবার মত ত নহেই—বরং গৌরব বোধ করিবার মত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে নব্য ভারতীয়গণের মধ্যে অধিকাংশেরই স্বদেশের গৌরবময় অতীত সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য তেমন আগ্রহ নাই। সেইজন্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতের দান সম্বন্ধে অনেকের মনে একটা ভুল ধারণা জন্মিয়াছে। যুগে যুগে ভারতে বিজ্ঞানচর্চ্চা কি ভাবে অগ্রসর হইয়াছে তাহার আলোচনা না করিলে ভারতীয় সভ্যতার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হইতে পারে না। প্রাচীন ভারতের ঋষিবৃন্দ কেবলমাত্র ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা ও পাঠ করিয়া এবং পরলোক সম্বন্ধে আলোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া সময় অতিবাহিত করিতেন, ইহলোকের সব কিছু সম্বন্ধে তাঁহারা একেবারেই উদাসীন ছিলেন, এরূপ ধারণা করিবার কোনই সঙ্গত কারণ নাই।

ভারতবর্ষ সুদূর অতীত কালে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করিয়াছিল এবং যে ভাবে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়াছিল তাহা

বর্ত্তমান কালের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণের আবিষ্কার ও প্রয়োগের সহিত তুলনীয়। এখনকার দিনে যেমন বৈজ্ঞানিক আলোচনাকে দুইটি মুখ্য বিভাগে ভাগ করা যায়, প্রাচীন ভারতের বৈজ্ঞানিক গবেষণাকেও ঠিক তেমনিই দুই ভাগে ভাগ করা যাইত। প্রথম ভাগ তত্ত্বমূলক—অর্থাৎ বিচারবুদ্ধি দ্বারা কোন বিষয়ের কারণ নির্ণয় ও তৎসম্পর্কীয় বিবিধ রহস্য উদ্ঘাটন। এই সকল রহস্য প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা যায় না; নানাপ্রকার যুক্তিতর্ক দ্বারা ইহাদের মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিতে হয় এবং আবিষ্কৃত সত্যটি প্রথমেই স্বীকার করিয়া লইয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ দ্বারা ইহার যথার্থতা প্রমাণ করিতে হয়। একটি উদাহরণ দ্বারা বিষয়টি সহজে বুঝিতে পারা যাইবে। আমরা জানি পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট অক্ষে সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহা এখন সর্ব্বজনস্বীকৃত সত্য, কিন্তু কোনও প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা ইহা প্রমাণ করা অসম্ভব। এই তত্ত্বের সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে হইলে ইহাকে প্রথমে স্বীকার করিয়া লইয়া ইহার প্রয়োগ দ্বারা অন্যান্য প্রাকৃতিক রহস্যের মর্ম্ম বুঝিতে হইবে; তবেই ইহাকে প্রকৃত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা যাইবে। বাস্তবিক বৈজ্ঞানিকেরা এই পন্থাই অনুসরণ করিয়াছেন। পৃথিবী যদি সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া ঘোরে তবে যে যে দিন যে যে সময়ে সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণ হইবার কথা যদি তাহাই হয় তবে এই সত্যকে স্বীকার না করিবার কোন কারণ নাই। এইভাবে এই সব তত্ত্বমূলক গবেষণা পরিচালিত হইয়া থাকে। প্রাচীন ভারতে এই ধরণের তত্ত্বমূলক গবেষণার কিছুমাত্র অভাব ছিল না। প্রমাণ স্বরূপ বলা যায়, প্রাচীন ভারতের বৈজ্ঞানিকগণ 'আকাশ' বলিয়া একপ্রকার বিশেষ পদার্থ কল্পনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা ধারণা করিয়াছিলেন যে এই 'আকাশ' সর্ব্বত্র সকল পদার্থের মধ্যে বিদ্যমান এবং সর্ব্বভূতে বিরাজমান; এই বস্তুটি

পদার্থের সমগুণবিশিষ্ট নহে, বরং জড়তাই ইহার প্রধান গুণ। আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিকগণ 'ঈথার' (ether) নামক যে পদার্থের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া লইয়াছেন ইহা কতকাংশে সেইরূপই।

বৈজ্ঞানিক আলোচনার দ্বিতীয় ভাগ পরীক্ষামূলক (experimental)। এই দিকেও ভারতীয় প্রতিভা অতি প্রাচীনকালেই প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। রসায়ন ও চিকিৎসা শাস্ত্রে হিন্দুদের নৈপুণ্য সম্বন্ধে নিম্নে যাহা বলা হইল তাহা দ্বারা আমাদের এই মন্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে।

জড়-বিজ্ঞানের মূলে অঙ্ক শাস্ত্র। ইহা অবিসংবাদিত ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে যে প্রাচীন ভারত অঙ্ক শাস্ত্রে সমগ্র পৃথিবীর শিক্ষাগুরু। দশমিক ভগ্নাংশের আবিষ্কার ভারতবর্ষেই হইয়াছিল। সংখ্যা লিখন প্রণালীরও উদ্ভব ভারতবর্ষে প্রথম ঘটে। আরবদিগের মধ্যবর্ত্তিতায় এই সকল আবিষ্কার ইউরোপে প্রচারিত হইয়াছিল। আর্য্যভট, বরাহমিহির, ভাস্করাচার্য্য, ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীপতি, লল্ল প্রমুখ বিশিষ্ট অঙ্কবিদ্ পণ্ডিতগণ প্রাচীন ভারতে গণিত শাস্ত্রের উন্নতি সাধন করিয়া অমর কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানে মহিলা-বৈজ্ঞানিকের দানও অবহেলা করিবার নহে। আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-জগতে বহু মহিলা-বৈজ্ঞানিক খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে রেডিয়াম আবিষ্কারক মাদাম কুরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এমনিই প্রাচীন ভারতে অঙ্ক শাস্ত্রে মৌলিক গবেষণার জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন লীলাবতী নামক মহিলা-বৈজ্ঞানিক।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপে কোপারনিকাস যে নূতন তথ্য আবিষ্কার করেন, ভারতে সেই তথ্য খৃষ্টের জন্মের কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ঋগ্বেদে বলা হইয়াছে যে নিরবলম্ব পৃথিবী মহাশূন্যে অবস্থিত। পরবর্ত্তী কালে নানাবিধ যুক্তি তর্ক দ্বারা ভারতে

এই মত সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আর্য্যভট খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে প্রচার করেন যে গোলাকার পৃথিবী মহাশূন্যে অহর্নিশি ঘুরিতেছে এবং কদম্ব পুষ্পের গ্রন্থিগুলির ন্যায় জলজ ও স্থলজ পদার্থনিচয় পৃথিবীর সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে। তিনি বলিতেছেন—"চলা পৃথিবী স্থিরা ভাতি"—সচলা পৃথিবী অচলা মনে হয়। পরবর্ত্তী যুগে লল্ল, শ্রীপতি, ব্রহ্মগুপ্ত, বরাহমিহির প্রভৃতি গণিতবিদ্ পণ্ডিতগণ আর্য্যভটের মতবাদ খণ্ডন করিবার চেষ্টা করেন। এখানে একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে লল্ল আর্য্যভটের অন্যতম প্রিয় শিষ্য হইয়াও গুরুর সিদ্ধান্ত স্বীকার করিতে পারেন নাই এবং বিরুদ্ধ মতবাদ প্রচার করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। ইহা দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় যে অন্ততঃ এই যুগে স্বাধীন চিন্তা ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। আপ্তবাক্য দ্বারা প্রভাবিত হইয়া নিজের স্বাধীন চিন্তাকে বিসর্জ্জন দিবার রীতি তখনও প্রচলিত হয় নাই।

বীজগণিত গণিত শাস্ত্রের একটী প্রধান অঙ্গ। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে মিশরীয় পণ্ডিত ডায়োফেন্টাস্ বীজগণিত আবিষ্কার করেন, কিন্তু দশম শতাব্দীর শেষার্দ্ধের পূর্ব্বে তাঁহার গ্রন্থ অন্য কোন ভাষায় অনূদিত হয় নাই। পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতে আর্য্যভট প্রথম বীজগণিত রচনা করেন ও তাঁহার পরে ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্করাচার্য্য, বরাহমিহির প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই শাস্ত্রের চর্চ্চা করেন। সুতরাং একথা স্বীকার করিতে হইবে যে ভারতীয় মনীষিগণ স্বাধীনভাবেই বীজগণিত আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

জ্যোতিষ শাস্ত্রে অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে অনেক গবেষণা হইয়া আসিতেছিল। ভারতীয় গণিতবিদেরা সকলেই জ্যোতিষ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। বরাহমিহির আর্য্যভটের অল্পকাল পরেই

বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি সূর্য্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের প্রকৃত কারণ আবিষ্কার করেন এবং পৌরাণিক কল্পনা খণ্ডন করেন। প্রাচীন ভারতে ত্রিকোণমিতিরও (Trigonometry) বিশেষ চর্চ্চা হইয়াছিল।

চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রাচীন ভারতের অবদান অতুলনীয়। চতুর্ব্বেদের অন্যতম অথর্ব্ববেদ মূলতঃ কায়-চিকিৎসার আদিগ্রন্থ। সামবেদে অস্ত্র-চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক শ্লোক পাওয়া যায়। বেদোত্তর যুগে দিবোদাস নামে আর্য্য চিকিৎসকের দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে সুশ্রুত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার রচিত 'সুশ্রুত সংহিতা' পাঠে বোঝা যায় প্রাচীন ভারতে অস্ত্র-চিকিৎসা কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল। সুশ্রুতের আবির্ভাবকাল খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দী। সুশ্রুতের সময় হিন্দু চিকিৎসা-শাস্ত্র কতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছিল তাহা ভাবিলে সত্যই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। মানবদেহের বিভিন্ন অংশনিচয়ের যে বিবরণ সুশ্রুত দিয়াছেন, বর্ত্তমান কালের বিশিষ্ট ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণের প্রদত্ত বিবরণ হইতে তাহা কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে সুশ্রুত তদীয় সংহিতাতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে একশত পঁচাত্তরটি রক্তবাহিনী শিরার দ্বারা সমগ্র দেহে রক্ত সঞ্চালিত হইতেছে। বিশুদ্ধ রক্ত যকৃৎ ও প্লীহা হইতে উদ্গত আপন আপন শিরার মধ্যে যতক্ষণ বিচরণ করে ততক্ষণ মানুষ সুস্থ থাকে, কিন্তু এই রক্ত দূষিত হইলে মানুষের নানাবিধ পীড়া জন্মে। ইউরোপে ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ বৈজ্ঞানিক হার্ভে রক্তসঞ্চালনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রণয়ন করিয়া যশস্বী হন, অথচ প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বেই ভারতীয় মনীষীবৃন্দ এই তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন! ভারতে যে শারীর বিজ্ঞানের যথোপযুক্ত চর্চ্চা হইত 'সুশ্রুত সংহিতা' পাঠে তাহাও জানা যায়। সুশ্রুত মানবদেহের বিভিন্ন অংশ ও তাহার সপ্ত ত্বক (skin and epidermis), সপ্ত কলা

(cellular tissues and fascia of the body), সপ্ত আশয় (organs অথবা receptacles), সপ্ত সেবনী (sutures), অন্ত্র (intestine), নব দ্বার, ষোড়শ কণ্ডরা, দ্বাদশ জাল (membranes), ষষ্ঠ কূর্চ্চ, চতুঃরজ্জু (Tendons), তিনশত অস্থি ও দুইশত দশ অস্থি-সন্ধি, পাঁচশত পেশী, সাতশত শিরা ও একশত সাতটি মর্ম্মস্থানের অতি সূক্ষ্মতম বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে শবব্যবচ্ছেদ করিয়া মানবদেহের গঠন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা না করিলে কেহই শারীরবিদ্যা সম্বন্ধে এরূপ বিস্তৃত গ্রন্থ লিখিতে পারে না।

বিখ্যাত পণ্ডিত ওয়েবার ও জার্ম্মান ডাক্তার হারস্বার্গ স্বীকার করিয়াছেন যে একস্থান হইতে চামড়া তুলিয়া অন্যস্থানে লাগান, কাটা নাক জোড়া দেওয়া এবং চক্ষের ছানি তোলা প্রভৃতি অস্ত্র-চিকিৎসার কয়েকটি কঠিন পদ্ধতি ইউরোপ ভারতীয় অস্ত্র-চিকিৎসকগণের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছে। অস্ত্র-চিকিৎসার সময় শরীরের কোন অংশ ছেদন করিবার পর বিশেষ সতর্কতা সহকারে ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দেওয়ার প্রথাকে 'ব্যাণ্ডেজ করা' (bandaging) বলা হয়। 'সুশ্রুত সংহিতা'য় এই প্রকার বন্ধনী ব্যবহার করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং বিভিন্ন প্রকার বন্ধনী ও সীবন (stitch) প্রক্রিয়ার উল্লেখ করা হইয়াছে।

আজকাল যুদ্ধের সময় বিশিষ্ট অস্ত্র-চিকিৎসকগণ সৈন্যদলের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন। রামায়ণে বর্ণিত আছে, লঙ্কার যুদ্ধে সুষেণ অস্ত্র-চিকিৎসকরূপে রামের সহিত লঙ্কায় অভিযান করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নকুল নিজেই ছিলেন অস্ত্র-চিকিৎসক। যুদ্ধের পূর্ব্বে পাণ্ডব ও কৌরবগণ সকলেই আহতদিগের চিকিৎসার উপযুক্ত বন্ধনী প্রভৃতি সংগ্রহ করাইয়াছিলেন।

আবহবিজ্ঞানেও প্রাচীন ভারতীয়গণ যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ

করিয়াছিলেন। বৃষ্টি মাপিবার যন্ত্র (Rain-guage instrument) তাঁহারা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে এবং অন্যান্য গণনা ও নানারূপ পরীক্ষা দ্বারা তাঁহারা আবহাওয়া সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারিতেন। বিভিন্ন বর্ণের এবং নানা শ্রেণীর মেঘ সম্বন্ধে হিন্দুরা সুতীক্ষ্ণ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। মেঘ কেন হয়, ইহার উচ্চতা কতদূর হইতে পারে, কত উচ্চে বিদ্যুৎ চমক ঘটিলে তাহা কিরূপ দেখাইবে, বিজলী চমকের শব্দ কতদূর হইতে শুনিতে পাওয়া যায়, কতদূর পর্য্যন্ত বায়ুস্তর বিস্তৃত, ভূমিকম্পের বিস্তৃতি কতদূর হইতে পারে ইত্যাদি বিষয়ে শ্রীপতি, বরাহমিহির, উৎপল প্রমুখ মনীষিগণ স্ব স্ব মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

প্রাচীন কালে ভারতে যে উচ্চশ্রেণীর রাসায়নিক গবেষণা পরিচালিত হইত তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। খৃষ্টের জন্মের বহু পূর্ব্বেই ঋষি কণাদ বৈশেষিক দর্শনে বস্তুর গুণাগুণ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার বিস্তারিত মত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। জড় বিজ্ঞানের মূলে রহিয়াছে পরমানুবাদ। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ইংরাজ বৈজ্ঞানিক ডাল্টন এই পরমানুবাদ আবিষ্কার ও পাশ্চাত্য জগতে ইহার প্রচার করেন। কণাদের আবিষ্কৃত পরমানুবাদ ও ডাল্টনের আবিষ্কৃত পরমানুবাদের মধ্যে অনেক মিল আছে। কণাদ শব্দের গতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা বর্ত্তমান কালের বৈজ্ঞানিকগণের মতেরই অনুরূপ।

ব্যবহারিক রসায়নে ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন কালে কতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছিল সংক্ষেপে তাহার দুই একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। বৈদিক যুগেই যে ভারতবর্ষ স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যবহার করিতে শিখিয়াছিল তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। যজুর্ব্বেদে সোনা ও রূপা ছাড়াও লোহা, সীসা এবং টিনের বর্ণনা পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে এই সব ধাতু

নিষ্কাষণের যে সকল প্রক্রিয়া প্রচলিত ছিল আজ তাহার কোন লিখিত বিবরণ পাওয়া সম্ভব নয়। প্রাচীন কালের অধিকাংশ গ্রন্থই অপ্রচলিত হইতে হইতে একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে; অনেক গ্রন্থ আবার হয়ত বা বৈদেশিক আক্রমণের ফলে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। গ্রীক ঐতিহাসিক মেগাস্থিনিসের বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে ধাতু নিষ্কাষণে ভারতীয়গণের অসামান্য নৈপুণ্য ছিল। তিনি আরও বলেন যে ভারতে সোনা, রূপা, তামা, লোহা, দস্তা, টিন এবং আরও অনেক ধাতু প্রচুর পরিমাণে পওয়া যায় এবং সেগুলি যুদ্ধাস্ত্র ও অলঙ্কার নির্ম্মাণের জন্য ব্যবহৃত হয়। ভারতীয় শিল্পীরা লোহার জিনিস নির্ম্মাণ করিতে কি আশ্চর্য্য দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। একখণ্ড লোহা ঘরের মধ্যে কয়েক মাস থাকিলেই মরিচা পড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু প্রায় ২৭০ মণ ওজনের একটি লৌহস্তম্ভ দিল্লীতে কুতব মিনারের পাশে আজ দেড়হাজার বৎসর দাঁড়াইয়া আছে, অথচ তাহাতে একটু মরিচার চিহ্নমাত্র নাই! এই লৌহস্তম্ভ ছাড়া আরও কয়েকটি প্রাচীন লোহার জিনিসও দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত মরিচা না ধরিয়া টিকিয়া আছে। সোমনাথের লোহার দরজা, নার্ভুরের ২৪ ফুট লোহার কামান, পুরীর লোহার গার্ডার প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় লৌহ শিল্পিগণের দক্ষতার প্রমাণ দেয়।

রসায়ন শাস্ত্র অতীতকালে আমাদের দেশে প্রধানতঃ চিকিৎসা বিজ্ঞানের অঙ্গ হিসাবেই গণ্য হইত। এজন্য চরক ও সুশ্রুত সংহিতায় নানা প্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উল্লেখ করা হইয়াছে।. ক্ষার (alkali) সম্বন্ধে সুশ্রুত অতি সুন্দর বিবরণ দিয়াছেন। তিনি ক্ষার প্রস্তুত ও রক্ষণপ্রণালী সম্বন্ধে যে সব কথা বলিয়াছেন, দুই হাজার বৎসর পরেও তাহার যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ পাওয়া যায় না।

আজও ক্ষার প্রস্তুত ও রক্ষণপ্রণালী মূলতঃ সুশ্রুত বর্ণিত রীতির অনুযায়ী। অম্লজাতীয় পদার্থের সহযোগে ক্ষারের তেজ প্রশমন ঘটে বলিয়া সুশ্রুত যে কথা বলিয়াছেন তাহা পরবর্ত্তী কালে অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এসিড ও এল্‌কালিতে লবণ প্রস্তুত হয় এবং উদ্ভূত পদার্থে এসিড বা এল্‌কালির মধ্যে কোনটারই বিশেষ গুণ বর্ত্তমান থাকে না। এসিড অম্লজাতীয় এবং এলকালি ক্ষারজাতীয় পদার্থ। সুশ্রুতের রাসায়নিক প্রক্রিয়া কত সুন্দর এই উদাহরণ হইতেই তাহা বোঝা যায়। চিকিৎসার উদ্দেশ্যে হিন্দুগণ নানাবিধ ধাতব লবণ ব্যবহার করিতেন। মকরধ্বজ ও রসসিন্দুর তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই সকল ঔষধ তৈরী করিতে সূক্ষ্ম রাসায়নিক জ্ঞানের প্রয়োজন। সে জ্ঞানে ভারতবর্ষ যে সমগ্র জগতের শিক্ষাগুরু তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনাল্ড প্রাচীন ভারতের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছেন। তাঁহার মতে ইউরোপ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ভারতের নিকট অসামান্য ঋণে ঋণী। তিনি বলেন, সংখ্যা লিখন ও দশমিক প্রণালী সমস্ত জগৎ ভারতের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছে। আর কিছুর জন্য না হইলেও শুধু এই জন্যই সমগ্র জগৎ হিন্দু বৈজ্ঞানিকগণের নিকট চিরকাল মস্তক অবনত করিয়া থাকিবে।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম যখন ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিল তখন সমস্ত দেশ জুড়িয়া নানাস্থানে মঠ, বিহার, স্তূপ ও মঠসংলগ্ন আরোগ্যশালা প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করিল। এই সকল স্তূপ ও বিহারগুলিই বিজ্ঞানচর্চ্চার—বিশেষ করিয়া চিকিৎসা ও রসায়ন বিজ্ঞান চর্চ্চার—কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইল। এই জন্যই ত্রয়োদশ

শতাব্দীর প্রারম্ভে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান আলোচনাও ভারতে বন্ধ হইয়া যাইতে আরম্ভ করিল এবং ক্রমশঃ ভারতীয় ইতিহাসের এক গৌরবময় যুগের অবসান ঘটিল। একদিকে বৌদ্ধ ধর্ম্মের পর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম যখন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল তখন জনসাধারণ এবং চিন্তাশীল ব্রাহ্মণগণ মহা উৎসাহে বৌদ্ধগণের সব কিছু ত্যাগ করিবার জন্য যত্নশীল হইলেন এবং সেই সঙ্গে বিজ্ঞানচর্চ্চাও দেশ হইতে উঠিয়া গেল। অন্যদিকে ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতেই বহিরাক্রমণ ও অন্তর্দ্বন্দ্বে ভারতের সাধারণ নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইতে লাগিল, ফলে কেহই নিরুদ্বেগে জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনায় আত্মনিয়োগ করিতে উৎসাহিত হইলেন না। এইজন্যই ভারতে বিজ্ঞান আলোচনা বন্ধ হইয়া গেল।

ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে বিজ্ঞান আলোচনা একেবারেই হয় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতে বিজ্ঞান আলোচনা পুনরায় অল্প অল্প আরম্ভ হইল সত্য, কিন্তু সে আলোচনায় ভারতীয়গণ অংশগ্রহণ করিতে পারিলেন না। কয়েক শতাব্দীর জড়তায় তাঁহারা তখনও বিশেষভাবেই আচ্ছন্ন ছিলেন। এই সময় যে সব ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক চাকুরী অথবা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ভারতে আসিয়াছিলেন প্রধানতঃ তাঁহারাই বিজ্ঞান আলোচনা করিতেন। ভারতীয়গণের এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। দুই হাজার বৎসরেরও পূর্ব্বে যে দেশের লোক শারীর বিজ্ঞানে অসামান্য পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন সেই দেশেরই লোক কালক্রমে শবব্যবচ্ছেদ করিলে সমাজে পতিত বলিয়া গণ্য হইতেন। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের সময়ে যখন তাঁহাদেরই একজন কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে শবব্যবচ্ছেদ করিলেন তখন কেল্লা হইতে তোপধ্বনি করিয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করা হইল!

ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের ফলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ভারতীয়গণের দৃষ্টি বিজ্ঞানচর্চ্চার প্রতি আকৃষ্ট হইল। সেকালে বৈজ্ঞানিক আলোচনা তরুণ বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট অঙ্গরূপে পরিগণিত হইত। এই সম্বন্ধে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলিয়াছেন—

"অক্ষয়কুমার 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় পদার্থবিদ্যা বিষয়ক যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, রাজেন্দ্রলাল 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে' ভূতত্ত্ব, প্রাণিবিদ্যা ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের অস্থিমজ্জাগত হইয়া থাকিবে। বাঙ্গালা সাহিত্যে বিজ্ঞানের যাহা কিছু সমাবেশ হইয়াছে, তজ্জন্য এই দুই মহাত্মার নিকট আমরা চিরঋণী থাকিব। ইঁহাদের কিছু পূর্ব্বে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লর্ড হার্ডিঞ্জের আনুকূল্যে Encyclopædia Bengalensis অথবা 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' আখ্যা দিয়া কয়েক খণ্ড পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। ইহাতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শনতত্ত্ব সকল প্রকাশিত হইত। কিন্তু ইঁহাদের পূর্ব্বেও বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসারের জন্য বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি হইয়াছিল। শ্রীরামপুরের মিশনারীগণকে বর্ত্তমান বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের জন্মদাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; তাঁহারাই আবার বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারেরও প্রথম প্রবর্ত্তক। আমাদের জাতীয় অভিমান আঘাতপ্রাপ্ত হয় বলিয়া এ কথা আমাদের ভুলিয়া যাইলে চলিবে না, কিংবা 'খৃষ্টানী বাঙ্গালা' বলিয়া তাঁহাদের কৃত কার্য্যকে উড়াইয়া দিলে চলিবে না; ঐতিহাসিক ন্যায়ের ও সত্যের তুলাদণ্ড হস্তে করিয়া যাহার যে সম্মান প্রাপ্য তাহাকে তাহা প্রদান করিতে হইবে।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম ইয়েট্স্ প্রথমে 'সার পদার্থ বিদ্যা' বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করেন। ইহাতে পদার্থবিদ্যা ভিন্ন মৎস্য, পতঙ্গ,

পক্ষী ও অন্যান্য জীবের বর্ণনা আছে। এতদ্ভিন্ন ‘কিমিয়া বিদ্যাসার’ নামক রসায়ন-বিদ্যা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ শ্রীরামপুর হইতে প্রচারিত হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় এই পুস্তকের সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ ‘সমাচার-দর্পণ’ নামে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশিত করেন, এবং তাঁহারাই আবার ‘দিগদর্শন’ নামক নানা তত্ত্ব-বিষয়িণী পত্রিকা পরিচালিত করিতেন। এই পত্রিকাতে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চ্চার প্রথম সূত্রপাত হয়।

ইহার পর ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ‘বিজ্ঞান-অনুবাদ সমিতি’ নামে একটি সমিতি স্থাপিত হয়। প্রোফেসর উইলসন্ এই সমিতির সভাপতি নিযুক্ত হন ও উক্ত সমিতির চেষ্টায় ‘বিজ্ঞান-সেবধি’ নামক গ্রন্থের ১৫ খণ্ড প্রকাশিত হয়। ইহার পর ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ‘বাঙ্গালা-সাহিত্য-সমিতি’ নামে আর একটি সমিতি স্থাপিত হয়। বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসার এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও যাহাতে বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে জ্ঞানালোক প্রবেশ করিতে পারে তদ্বিষয়ে ইহার লক্ষ্য ছিল। মহাত্মা বেথুন ও বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এই সভার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; এতদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট মাসিক ১৫০৲ চাঁদা দিয়া ইহার আনুকূল্য করিতেন। এই সভার উদ্যোগেই ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র ‘বিবিধার্থ সংগ্রহ’ প্রকাশ করেন। মহামতি হড্‌সন প্র্যাট এই সমিতির স্থাপয়িতাদিগের মধ্যে অন্যতম উদ্যোগী সভ্য ছিলেন। তিনি উক্ত সমিতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই :—

“বাঙ্গালার অধিবাসীদিগকে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা দিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাদিতে ব্যুৎপন্ন করার আশা একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং জাতীয় ভাষায় ইহাদিগের শিক্ষার পথ প্রশস্ততর করা কর্ত্তব্য। এই

নিমিত্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন করা একান্ত প্রয়োজনীয়।...... ইহাদের নিমিত্ত সরল সুখপাঠ্য গ্রন্থ প্রচার করিয়া পাঠ-লিপ্সার সৃষ্টি করিতে হইবে। জ্ঞানার্জ্জনের নিমিত্ত তৃষ্ণা বৃদ্ধি করিতে হইবে; নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে অল্প মূল্যের গ্রন্থ প্রচার করিতে হইবে। সেই সকল গ্রন্থে বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও মানব শরীর তত্ত্ব সম্বন্ধীয় সহজ ও চিত্তাকর্ষী প্রবন্ধ থাকিবে। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধেও প্রবন্ধাদি লিখিয়া প্রচার করিতে হইবে। ****এই সকল প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত সহজ ও সরল সাহিত্যপ্রচার অতি আবশ্যক। এই সমিতিকে এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে হইবে।"

বিজ্ঞান প্রচার সম্বন্ধে এই সমিতির আশা তাদৃশী ফলবতী হয় নাই। সতের খানি পুস্তক প্রকাশের পর সমিতি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, গল্প ও আমোদজনক পুস্তকই এদেশের পাঠক সাধারণের অধিকতর প্রিয়। এতদ্‌ব্যতীত অপর শ্রেণীর পুস্তক আদৌ আদরে গৃহীত হয় না।

এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা উচিত যে, কলিকাতা, হুগলী ও ঢাকা—এই তিন স্থানে তিনটি নর্ম্যাল বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের ব্যবহারার্থ পদার্থবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, জ্যামিতি, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ক অনেকগুলি বাঙ্গালা পুস্তক প্রণীত হয়। ইহা ভিন্ন ছাত্রবৃত্তি ও মাইনর পরীক্ষার উপযোগী পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও রাসায়নিক বিদ্যা বিষয়ক অনেক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। মেডিক্যাল স্কুলসমূহের পাঠ্য অস্থিবিদ্যা, শারীরবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ঘটিত অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থও বাঙ্গালা ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ প্রচারেও যে বাঙ্গালা ভাষার অনেকটা উন্নতি হইয়াছে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"*

* আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, 'বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান'—দ্বিতীয় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণ।

বঙ্গ সাহিত্যে বিজ্ঞানের আলোচনা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হইল। ক্রমশঃ নবপ্রতিষ্ঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত কয়েকজন মনীষী স্বাধীন বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন। ফলে কলিকাতা ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রথম কেন্দ্ররূপে পরিণত হইল।

আধুনিক কালে ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার অগ্রদূত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং স্যার জগদীশচন্দ্র বসু। ডাঃ মহেন্দ্রলাল কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে এম্. ডি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। বিজ্ঞানচর্চ্চা না করিলে যে ভারতের উন্নতি নাই, বৈজ্ঞানিক গবেষণার অভাবে ভারতীয়গণকে অনন্ত কাল কুসংস্কার ও দারিদ্র্যের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে হইবে, ইহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই নিজের যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া এবং দেশের লোকের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া তিনি বৈজ্ঞানিক শিক্ষা বিস্তার ও গবেষণার জন্য কলিকাতায় 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্স' (Indian Association for the Cultivation of Science) নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিলেন। পরবর্ত্তী কালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রমন এখানে নিয়মিত গবেষণা করিতে আরম্ভ করেন ও নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রথম আরম্ভ করেন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও স্যার জগদীশচন্দ্র বসু। কালক্রমে ইঁহাদের ছাত্রমণ্ডলী সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়েন এবং তাঁহাদের আদর্শে নবাগত ছাত্রমণ্ডলীও অনুপ্রাণিত হইতে থাকেন। বিগত পঞ্চাশ বৎসরের চেষ্টার ফলে সমগ্র বিশ্বে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ এখন সম্মানের আসন

লাভ করিয়াছেন। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র প্রথমে পদার্থবিদ্যায় গবেষণা করিয়া বিস্মিত জগতের সম্মুখে বেতারের মূল সত্য প্রমাণ করেন; প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁহার নিজের বসিবার ঘরে একটি যন্ত্র স্থাপন করিয়া তাহার সাহায্যে তিনি বেতারের তরঙ্গ সৃষ্টি করিলেন। ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যাপক ফাদার লাঁফো দ্বার রক্ষা করিতে লাগিলেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের ঘরে বেতার গ্রাহক যন্ত্রের সঙ্গে একটি টোটাভরা রিভলভার সংযুক্ত রাখা হইল। দুই ঘরের মধ্যে কোন সংযোগ রহিল না। আচার্য্য জগদীশ প্রেরকযন্ত্র চালাইতেই আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের ঘরের রিভলবারটি হইতে গুলি ছুটিল, সমগ্র জগতে বেতার তরঙ্গের মূল তথ্য নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইল। পরবর্ত্তী কালে জগদীশচন্দ্র বেতার সম্বন্ধীয় গবেষণা ত্যাগ করিয়া উদ্ভিদের জীবন সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন এবং জীবের ন্যায় উদ্ভিদেরও জীবন ও অনভূতি আছে ইহা প্রমাণ করেন। তিনি পরীক্ষা দ্বারা দেখান যে ক্লোরোফর্ম্ম নামক ঔষধ প্রয়োগে যেমন প্রাণীরা অজ্ঞান হইয়া



স্যার জগদীশচন্দ্র

যায়, উদ্ভিদও তেমনি অজ্ঞান হয়। তাঁহার পরীক্ষা দেখিয়া সমস্ত জগৎ ভারতীয় সংস্কৃতির এই অগ্রদূতকে বিজয়-মাল্য দ্বারা অভ্যর্থনা করিল।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রসায়ন বিজ্ঞানে অনেক মূল্যবান গবেষণা করিয়াছেন। দেশ বিদেশে তাঁহার নিজের এবং তাঁহার ছাত্রবৃন্দের গবেষণা অতি উচ্চ প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে। জ্ঞান-তপস্বী আচার্য্য আপনার যথা সর্ব্বস্ব দিয়া ভারতে এমন একদল রাসায়নিক গড়িয়া তুলিয়াছেন যাঁহারা একান্ত মনে রসায়ন চর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রতিভা প্রাচীন ভারতের প্রতি শ্রদ্ধায় ভরপূর। প্রাচীন ভারতে রসায়ন শাস্ত্র কতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছিল তাহা আচার্য্যদেবের রচিত 'History of Hindu Chemistry' নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়া বিশ্ববাসী জানিতে পারিয়াছে।



আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

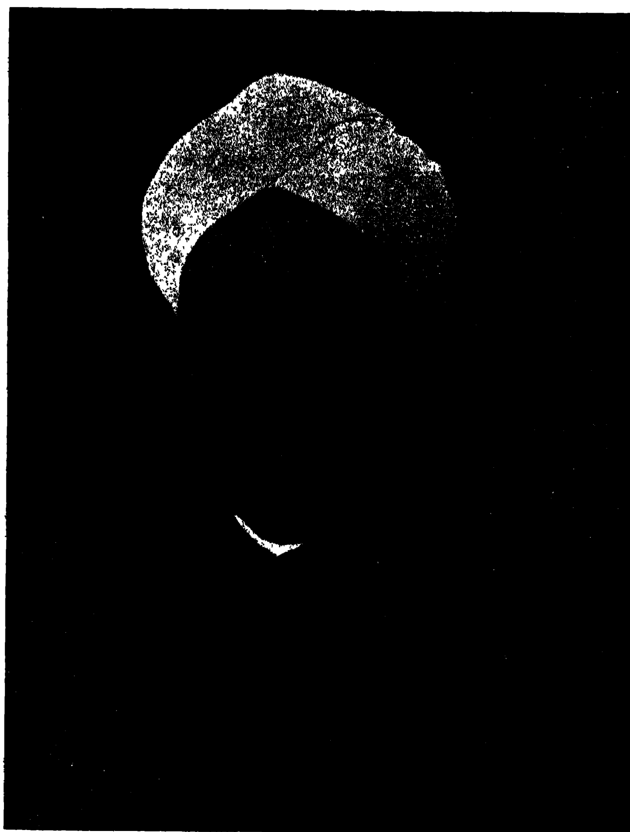
বর্ত্তমান কালে স্বর্গীয় রামানুজম্ অঙ্কশাস্ত্রে যে মূল্যবান গবেষণা করিয়াছেন তাহার তুলনা পাওয়া কঠিন। রামানুজম্ কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ পান নাই। দরিদ্র পিতার সন্তান, লেখাপড়ায়

আগ্রহ থাকিলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা অতিক্রম করিতে না পারিয়া তিনি ত্রিশ টাকা বেতনে মাদ্রাজ পোর্ট ট্রাষ্টে কেরাণীগিরি চাকুরী গ্রহণ করেন। সেখান হইতে দুই একজন হিতৈষীর চেষ্টায় অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার জ্ঞানের কথা ইউরোপে ছড়াইয়া পড়ে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের চেষ্টায় অবশেষে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্য গমন করেন। কিন্তু সেখানে দুরারোগ্য যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি দেশে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন। অকালে ভারতের এই ক্ষণজন্মা অঙ্কবিদের জীবনান্ত না ঘটিলে তিনি জ্ঞানের পরিধি কতখানি বৃদ্ধি করিতে পারিতেন তাহা কে বলিতে পারে?

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র এবং আচার্য্য জগদীশচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজের পরীক্ষাগারেই গবেষণা করিতেন। উপযুক্ত যন্ত্রাদির অভাবে তাঁহাদিগকে বহু অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। স্বর্গীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় এবং দানবীর স্যার তারকনাথ পালিত ও স্যার রাসবিহারী ঘোষের বদান্যতায় এই অসুবিধা দূর হইয়াছে। এই তিন মহাপ্রাণ ব্যক্তির সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান কলেজে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অধ্যাপনা ও গবেষণার সুবন্দোবস্ত আছে। বহু কৃতী অধ্যাপক ও ছাত্রের সম্মিলনে এই বিজ্ঞান কলেজ ভারতে বৈজ্ঞানিক আলোচনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে।

বিজ্ঞান চর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করিয়া যে সব মনীষী সমগ্র পৃথিবীতে ভারতের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে স্যার চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রমন অন্যতম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্সের' অধ্যাপকরূপে তিনি পদার্থবিদ্যায় যে অমূল্য গবেষণা করেন তাহার ফলে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ

করিয়াছেন। তাঁহার আবিষ্কৃত তথ্য 'রমন এফেক্ট' (Raman Effect) নামে জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।



স্যার সি. ভি. রমন

পদার্থবিদ্যায় আর একজন কৃতী ভারতীয় গবেষক অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা। তিনি বর্ত্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম

শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক। তিনি নিজের চেষ্টায় প্রথমতঃ গ্রহনক্ষত্র সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন। এই বিষয়ে তাঁহাকে উপদেশ দিতে সমর্থ বৈজ্ঞানিক তখন ভারতবর্ষে কেহই ছিল না। অধ্যাপক সাহা তাঁহার প্রথম দুইটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ বিদেশের জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কোন পত্রিকায় প্রেরণ করিলে তাহা প্রকাশের অযোগ্য বিবেচিত হইয়া ফিরিয়া আসিল, কিন্তু তিনি হতাশ হইলেন না। তিনি পুনরায় প্রবন্ধ দুইটি লণ্ডনের বিখ্যাত বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পত্রিকা 'ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিনে' (Philosophical Magazine) পাঠাইলেন এবং ঐ পত্রিকা প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া এই তরুণ বৈজ্ঞানিককে জগতের সমস্ত বৈজ্ঞানিকের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। আজ অধ্যাপক সাহার নাম ও তাঁহার আবিষ্কৃত 'আইওনাইজেশন ফরমুলা'র (Ionisation Formula) কথা না জানে এমন পদার্থবিজ্ঞানবিদ্ পৃথিবীতে নাই।



অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা

পদার্থ বিজ্ঞানের তত্ত্বমূলক গবেষণায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

সত্যেন্দ্রনাথ বসুর গবেষণা জগতে সর্ব্বত্র সমাদর লাভ করিয়াছে। গবেষণার ক্ষেত্রে ইহার অবদান অসামান্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আপেক্ষিক তত্ত্বের (Theory of Relativity) আবিষ্কার করিয়া জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন সমস্ত জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। অধ্যাপক বসু এই আপেক্ষিক তত্ত্ব সম্বন্ধে এমন মূল্যবান গবেষণা করিয়াছেন যে আইনষ্টাইন তাঁহার মতবাদ গ্রহণ করিয়া আরও নূতন নূতন তথ্য প্রচার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। অধ্যাপক বসুর এই গবেষণা 'বসু-আইনষ্টাইন তত্ত্ব' (Bose-Einstein Theory) নামে সমগ্র জগতে আদৃত হইয়াছে।

ডাঃ কে. এস. কৃষ্ণণও আধুনিক ভারতীয় পদার্থবিদ্‌গণের মধ্যে একজন কৃতী গবেষক। তাঁহার গবেষণাও জগতে সর্ব্বত্র নূতন প্রেরণার সঞ্চার করিয়াছে। তিনি বর্ত্তমানে 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েন ফর দি কাল্টিভেসন অব সায়েন্সের' অধ্যক্ষ।

সম্প্রতি লোকান্তরিত ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অঙ্কবিদ্ স্যার মহম্মদ সুলেমানও আপেক্ষিক তত্ত্ব সম্বন্ধে অতি মূল্যবান গবেষণা করিয়াছিলেন। তিনি এলাহাবাদ হাই কোর্টের প্রধান বিচারক ছিলেন এবং পরে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের অন্যতম বিচারক হইয়াছিলেন। বিচারকের গুরু কর্ত্তব্য ও দায়িত্বভার যথাযথরূপে পালন করিয়াও এই বৈজ্ঞানিক অঙ্কশাস্ত্রে যথেষ্ট গবেষণা করিয়া জগতের বিদ্বৎ সম্মেলনে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন।

কেবলমাত্র অঙ্ক, রসায়ন ও পদার্থ-বিজ্ঞানেই ভারতীয় গবেষকগণের গবেষণা ফলপ্রসূ হইয়াছে এরূপ মনে করিলে ভুল করা হয়। উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানে গবেষণা করিয়া লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বীরবল সাহনী সমস্ত জগতের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। আধুনিক

চিকিৎসা-বিজ্ঞানেও ভারতবাসীর অবদান উল্লেখযোগ্য। এককালে ভারতে কালাজ্বর ছিল দুরারোগ্য ব্যাধি। সহস্র সহস্র লোক এই ব্যাধির প্রকোপে জীবনলীলা সাঙ্গ করিত। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী কালাজ্বর সম্বন্ধে সুদীর্ঘকাল গবেষণা করিয়া রোগ নির্ণয়ের বিভিন্ন পরীক্ষা উদ্ভাবন করেন এবং রোগ দূরীকরণের জন্য 'ইউরিয়া ষ্টিবামাইন' নামক ঔষধ আবিষ্কার করেন। কালাজ্বর আজ কাল মোটেই মারাত্মক ব্যাধির মধ্যে গণ্য হয় না। বর্ত্তমানে প্লেগ, ম্যালেরিয়া, কুষ্ঠ, যক্ষ্মা প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধি সম্বন্ধেও ভারতীয়গণ মূল্যবান গবেষণা করিতেছেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার এক বিশিষ্ট অধ্যায়ের সূচনা হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বর্ত্তমানে প্রত্যেক ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ই শিক্ষক ও ছাত্রগণকে গবেষণার সুযোগ দিতেছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত আরও কয়েকটি বিশিষ্ট গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইতেছে। ইহার মধ্যে বাঙ্গালোর সহরে অবস্থিত ইণ্ডিয়ান সায়েন্স ইন্ষ্টিটিউট, (Indian Institute of Science) এবং কলিকাতায় অবস্থিত বসু বিজ্ঞান মন্দির (Bose Research Institute) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বোম্বাইয়ের ক্রোরপতি পরলোকগত স্যার জে. এন. টাটা ভারতবাসীর বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও গবেষণার জন্য যে বিপুল অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন প্রধানতঃ তাহা দ্বারাই ১৯১১ খৃষ্টাব্দে প্রথমোক্ত প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে টাটা ভাণ্ডার ব্যতীত মহীশূররাজ এবং ভারত সরকারের তহবিল হইতে প্রাপ্ত অর্থে ইহার ব্যয় নির্ব্বাহ হইতেছে। এই প্রতিষ্ঠানে তড়িৎ বিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সম্বন্ধে মূল্যবান গবেষণা হইয়া থাকে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজের সমগ্র জীবনের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ এই প্রতিষ্ঠানে দান করেন। কৃতবিদ্য বৈজ্ঞানিকগণ এই প্রতিষ্ঠানে গবেষণা করিয়া থাকেন।

ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে একদল বৈজ্ঞানিক গবেষক গড়িয়া উঠিতেই তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান ও আলাপ আলোচনার একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হইতে লাগিল। ইহার ফলে স্বর্গীয় মনীষী স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ১৯১৪ সালের জানুয়ারী মাসে কলিকাতায় 'ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস' (Indian Science Congress) প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার প্রথম অধিবেশনের ছয়টি বিভাগে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকবৃন্দের মোট পঁয়ত্রিশটি মৌলিক গবেষণার বিবরণ পঠিত হয়। ইহার পর হইতে প্রতিবৎসর জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে ভারতের বিভিন্ন শিক্ষা কেন্দ্রে এই কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়া থাকে। ভারতে বিজ্ঞান আলোচনার ক্ষেত্র কতদূর প্রসারিত হইয়াছে তাহা বুঝিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে ১৯১৪ সালে যে সভার ছয়টি বিভাগে পঁয়ত্রিশটি নিবন্ধ পঠিত হইয়াছিল, ২৫ বৎসর পর তাহার রজত জয়ন্তী উপলক্ষে বিশিষ্ট ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণের উপস্থিতিতে ১৯৩৮ সালে সেই সভার তেরটি বিভাগে আটশত মৌলিক নিবন্ধ পঠিত এবং বাইশটি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

কয়েক শতাব্দীব্যাপী নিশ্চেষ্টতার পর মাত্র পঞ্চাশ বৎসর হইল ভারতীয়গণ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে। তাঁহাদের গবেষণার আয়োজনও পর্য্যাপ্ত নহে। নানা অসুবিধা এবং বিপত্তির

মধ্যেও আজ ভারতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সম্বন্ধে যেরূপ গবেষণা চলিতেছে তাহাতে সত্যই উল্লসিত হইবার কারণ আছে। ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণের এই অল্প সময়ের কার্য্যাবলী প্রত্যক্ষ করিয়া মনে হয় যে কবির ভবিষ্যদ্বাণী

"বল বল বল সবে
শত বীণা বেণু রবে
ভারত আবার জগৎ সভায়
শ্রেষ্ঠ আসন লবে"

হয়ত অদূর ভবিষ্যতেই সার্থক হইবে।

ভারতের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি

ভারতের সভ্যতা অতি সুপ্রাচীন। কবে, কোথায়, কিরূপ পরিবেষ্টনীর মধ্যে ইহার উদ্ভব হইয়াছিল, সেই আদিম ইতিহাস আজিও বিস্মৃতির মধ্যেই লুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। বর্ত্তমানে পুরাতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব সংক্রান্ত বিভিন্ন আবিষ্কার ও গবেষণার ফলে আমাদের দৃষ্টি অনেকাংশে প্রসারিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু এ পর্য্যন্ত ভারত ইতিহাসের যে সকল উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে তাহা ভারতীয় সভ্যতার আদিম বিবরণ সম্যকরূপে আলোচনা ও উপলব্ধি করিবার পক্ষে মোটেই পর্য্যাপ্ত নহে। তবে এইটুকু শুধু নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে সাধারণতঃ যে ধারণা পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছিল তাহা আর এখন কোনক্রমেই মানিয়া লওয়া যায় না। কোনও আদিম যুগে আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আসিয়া প্রথমে পঞ্চনদ অধিকার করেন এবং ক্রমশঃ ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে ছড়াইয়া পড়েন, সঙ্গে সঙ্গে যে সভ্যতা গড়িয়া উঠে তাহা অবিমিশ্র আর্য্যসভ্যতা এবং বেদই তাহার মূল—এরূপ কোন সিদ্ধান্ত আজিকার দিনে একেবারেই অচল।

বিভিন্ন প্রকার গবেষণার ফলে ভারতে আর্য্যপূর্ব্ব কয়েকটি জাতির অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অষ্ট্রিক বা অষ্ট্রলয়েড্ জাতি এবং প্রাগৈতিহাসিক মোহেন-জো-দড়োর অধিবাসীদিগের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভাষাতত্ত্ববিদ্গণের

মতে "অষ্ট্রিক জাতীয় লোকেরাই ভারতে প্রথম কৃষিকার্য্য ও তদবলম্বনে সঙ্ঘবদ্ধ সুসভ্য জীবনের পত্তন করে। উহারা ধান, পান, কলা ও নারিকেলের চাষ করিত; পাহাড়ের গা কাটিয়া ধানের ক্ষেত প্রস্তুত করিত। লাঙ্গলের জন্য তীক্ষ্ণমুখ কাষ্ঠদণ্ড ব্যবহার করিত। ধনুর্বাণ ইহাদের প্রধান অস্ত্র ছিল।" বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে "উত্তর ভারতে গঙ্গাতীরে প্রথমতঃ এই অষ্ট্রিক জাতির লোকেরাই বাস করে; সেখানে ইহারা কৃষিমূলক একটা সংস্কৃতি গড়িয়া তুলে। ইহাদের কৃষিমূলক সংস্কৃতিই ভারতের সভ্যতার মৌলিক আধার বা ভিত্তি" এবং "ভারতের ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে, ধান, পান, হলুদ, সিন্দূর, কলা, সুপারি প্রভৃতির স্থান অষ্ট্রিক প্রভাবেরই ফল।"

দ্বিতীয়তঃ, মোহেন-জো-দড়ো ও হরপ্পায় আবিষ্কৃত অতি প্রাচীন এক বিরাট পৌর সংস্কৃতির ধ্বংসাবশেষ আমাদের সম্মুখে ভারতের ইতিহাসের এক লুপ্ত অধ্যায় খুলিয়া ধরিয়াছে। বিভিন্ন দিক হইতে বিবেচনা করিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়াছেন যে মোহেন-জো-দড়ো ও হরপ্পার সংস্কৃতি অনার্য্যদিগেরই কীর্ত্তি, আর্য্যদিগের সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই। কেহ কেহ বলেন যে মোহেন-জো-দড়োতে অন্ততঃ চারিটি বিভিন্ন জাতীয় লোক বিদ্যমান ছিল। স্যর জন মার্শালের অভিমত এই যে, এই পৌর সভ্যতা "হয়ত কোন জাতিবিশেষের সৃষ্টি নয়, প্রধানতঃ স্থান ও স্থানীয় নদীর পরিবেষ্টনীর মধ্যে বিভিন্ন জাতির আহৃত উপাদান ও আনুকূল্যের দ্বারা এই বিরাট সভ্যতার পরিপোষণ ও অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি পাইয়াছিল।" আবার কেহ কেহ এই সভ্যতাকে প্রধানতঃ দ্রাবিড়ীয় লোকদিগের কীর্ত্তি বলিয়াই অনুমান করেন।

সে যাহাই হউক, মোহেন-জো-দড়োর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে তথাকার অধিবাসীদিগের ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে যে উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে

তাহা অত্যন্ত বিস্ময়কর। মোহেন-জো-দড়োর একটি শীল মোহরে "যোগাসনে উপবিষ্ট এক ত্রিবক্ত্র দেবমূর্ত্তির চতুষ্পার্শে ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার, মহিষ, এবং অধোদেশে মৃগ ক্ষোদিত রহিয়াছে। ইহাতে অনুমিত হয়, শিবকে এখানে শুধু মহাযোগীবেশে নয়, পশু-পতি ভাবেও কল্পনা করা হইয়াছে।" শুধু এই একটিই নয়, যোগাবিষ্ট ভাবের প্রস্তরমূর্ত্তি মোহেন-জো-দড়োতে আরও অনেকগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে। যোগসাধনা ভারতীয় ধর্ম্মজীবনে পূর্ব্বাপরই যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে ইহা সুবিদিত। দেখা যাইতেছে যে আর্য্যপূর্ব্ব যুগেও এই সাধনা প্রচলিত ছিল। সাধারণ বুদ্ধিতে ইহাই মনে হয় যে আর্য্যেরা অনার্য্যদের নিকট হইতেই ইহা গ্রহণ করিয়াছে এবং ক্রমে ইহাকে নিজেদের ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছে।

শুধু ইহাই নহে। মোহেন-জো-দড়ো ও হরপ্পায় নানারূপ প্রস্তর ও মৃত্তিকা নির্ম্মিত অসংখ্য লিঙ্গ ও বলয়াকৃতি দ্রব্যসমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে লিঙ্গপূজার যে বহুল প্রচলন ছিল ইহা সহজেই অনুমিত হয় এবং ইহাই সম্ভব যে এই লিঙ্গপূজাও অনার্য্যদিগের নিকট হইতে গৃহীত হইয়া ক্রমে ভারতীয় ধর্ম্মে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে এই লিঙ্গপূজা অবৈদিক ধর্ম্ম, কারণ "ঋগ্বেদে শিশ্নদেবদের প্রতি যথেষ্ট ভৎর্সনা-বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়।"

মোহেন-জো-দড়োতে ও হরপ্পায় অসংখ্য মৃন্ময়ী মূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছে। বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেন যে "ইহারা ব্রত-উপলক্ষে নির্ম্মিত মাতৃকা কিংবা প্রকৃতি দেবীর মূর্ত্তি; অথবা বাড়ীর দেবালয়ে প্রতিষ্ঠিত কোন দেবীমূর্ত্তি।" ইহারা যে মাতৃকামূর্ত্তি কিংবা মাতৃকা স্থানীয় অন্য কোন প্রতিমূর্ত্তি সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

শিবপূজার ন্যায় মাতৃকা-পূজাও ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতেই ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে এবং এই প্রাগৈতিহাসিক মূর্ত্তিগুলিই "সম্ভবতঃ মাতা কিংবা মহামাতা এবং শক্তি বা প্রকৃতিদেবীর আদি অবস্থা।"

সুতরাং ইহা নিশ্চিত যে ভারতীয় ধর্ম্ম কেবলমাত্র আর্য্য ধর্ম্ম নহে, আর্য্য-অনার্য্য ভাবধারার সংমিশ্রণে উদ্ভূত এক অভিনব ধর্ম্ম। এই সংমিশ্রণ কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ে আরম্ভ হইয়া আবার এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে শেষ হইয়া যায় নাই। ভারতবর্ষে প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে আর্য্য সভ্যতার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে এই সংমিশ্রণের নূতন নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে এবং বরাবরই ইহা চলিয়া আসিতেছে। ভারতের প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থগুলি প্রণিধান পূর্ব্বক আলোচনা করিলে এ বিষয়ে আর বিশেষ কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকে না। সর্ব্বপ্রথম অথর্ব্ববেদের কথাই ধরা যাইতে পারে। অথর্ব্ববেদ হিন্দুর চতুর্থ বেদ, কিন্তু এই গ্রন্থে আমরা যে মানসিক আবহাওয়ার পরিচয় পাই তাহা যেন অনেকাংশেই অভিনব এবং প্রকৃত বৈদিক ভাবধারা হইতে স্বতন্ত্র। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে অথর্ব্ববেদ আর্য্য ও অনার্য্য ভাবধারার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। ঋগ্বেদে আমরা দেখি মিত্র, অগ্নি, ইন্দ্র, রুদ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতার উপাসনা, সহজ, সরল ভাষায় সরল আরাধনা, ভক্তি ও বিশ্বাসের একটি সুন্দর চিত্র। কিন্তু অথর্ব্ববেদে দেবদেবীর স্থানে ভূত, প্রেত, পিশাচাদির আবির্ভাব সহসা আমাদিগকে যেন একটা অন্য জগতে লইয়া যায়। ভক্তির স্থান ইহাতে বিশেষ নাই, বরং ভয়েরই প্রাধান্য দৃষ্ট হয়; উপাসনা এখানে যেন যাদুবিদ্যারই নামান্তর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভূত, প্রেত, পিশাচাদির আতঙ্কে লুপ্ত-জ্ঞান কতকগুলি লোক যেন ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা ও নানাবিধ মন্ত্রশক্তির সাহায্যে উহাদের হস্ত

হইতে নিষ্কৃতির জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত। ঋগ্বেদেও রাক্ষসাদির উল্লেখ নাই এমন নহে, এবং উহারা যে অত্যন্ত শক্তিশালী এবং সর্ব্বদা মানুষের অনিষ্টসাধনেই তৎপর এই ধারণাও ব্যাপকভাবেই দেখা যায়; কিন্তু পার্থক্য এই যে ঋগ্বেদে দেবতারাই আশ্রয়স্থল। এ বিশ্বাস সেখানে বদ্ধমূল যে দেবতারা রাক্ষসদের অপেক্ষা অনেক অধিক শক্তিশালী এবং তাঁহাদের তুষ্ট করিতে পারিলেই রাক্ষসদের হস্ত হইতে সহজে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতে পারে। আর অথর্ব্ববেদে আমরা পাই ভূত প্রেত রাক্ষসাদিরই সাক্ষাৎ আরাধনা এবং নানাবিধ যাদুমন্ত্রের ছড়াছড়ি। ঋগ্বেদে মন্ত্রগুলি ভক্তি সাধনেরই অঙ্গ, আর অথর্ব্ববেদে উহারা যেন কুসংস্কারেরই নামান্তর। সুতরাং দেখা যায় যে অথর্ব্ববেদে আমরা একটা অবৈদিক ভাবধারার স্পষ্ট পরিচয় পাই এবং উহা যে অনার্য্য ধর্ম্মের প্রভাবে প্রভাবান্বিত সে বিষয়েও বিশেষ সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

এই সম্পর্কে ইহাও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে অথর্ব্ববেদ গোড়াতেই বেদের মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে নাই। প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে অনেক সময়ে কেবলমাত্র তিন বেদেরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; অবশ্য কালক্রমে অথর্ব্ববেদও বেদের পর্য্যায়ে উঠিয়াছে এবং পরবর্ত্তী কালে তান্ত্রিকেরা তাঁহাদের মারণ, উচাটন প্রভৃতি গুহ্য বিদ্যা ও গুপ্ত সাধনা এই অথর্ব্ববেদের ভিত্তিতেই গড়িয়া তুলিয়াছেন। পক্ষান্তরে, অথর্ব্ববেদে আর্য্য-প্রভাবেরও অসদ্ভাব নাই। দার্শনিক দৃষ্টিতে বিচার করিলে অথর্ব্ব-বেদে আমরা ঋগ্বেদ অপেক্ষাও উচ্চতর ভাবধারার পরিচয় পাই এবং আর্য্য সংস্পর্শে আসিয়া অনার্য্য ধর্ম্ম প্রসূত প্রেততত্ত্বও যে অনেকটা ভদ্রভাবাপন্ন হইয়াছে ইহাও সহজেই বুঝিতে পারা যায়। প্রকৃত কথা, এই আর্য্য-অনার্য্য সংমিশ্রণ

বিশৃঙ্খলভাবে হয় নাই। ভারতীয় আর্য্য-প্রতিভার বৈশিষ্ট্যই এই যে আর্য্যেরা এখানে অনেক কিছুই অনার্য্যদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু যাহা গ্রহণ করিয়াছে তাহা আর্য্য-সংস্কারে প্রভাবান্বিত করিয়া নিজের করিয়া লইয়াছে। কালক্রমে কতটুকু আর্য্য, কতটুকু অনার্য্য তাহার বিশেষ কোনও সীমা নির্দ্দেশ থাকে নাই, এক ধর্ম্মের বেষ্টনীর মধ্যেই ওতঃপ্রোতভাবে বিভিন্ন ভাব ও আচার মিশিয়া গিয়াছে।

মহাভারতে আমরা আরও ব্যাপকভাবে এই সংমিশ্রণের ইতিহাস অনুসরণ করিতে পারি। কালক্রমে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে আর্য্যদিগের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে এক বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইল। বিভিন্ন জাতীয় অসংখ্য অনার্য্য আর্য্য-সমাজের গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া পড়িল। তাহাদের ধর্ম্ম, তাহাদের সামাজিক রীতিনীতি, তাহাদের জীবনের আদর্শ, সমস্তই আর্য্যদিগের নিকট নিতান্ত অদ্ভুত ও বর্ব্বরোচিত মনে হইল। কিন্তু সংখ্যায় ইহারাই অধিক, সুতরাং বলপূর্ব্বক ইহাদের উপর নূতন ধর্ম্ম ও সভ্যতা চাপাইয়া দেওয়ার সাধ্য আর্য্যদের ছিল না; বরং উহাদের চাপে নিজেদের বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলিবারই সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছিল। সুতরাং এই অনার্য্যদিগের কুলদেবতা প্রভৃতিকে আংশিকভাবে স্বীকার করিয়া, নানাপ্রকার রূপক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার সাহায্যে অনার্য্য-সেবিত দেবদেবীগণকে আর্য্য পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া, এবং ইহাদের ধর্ম্মজীবনে ও নৈতিক আদর্শে ধীরে ধীরে আর্য্যপ্রভাব অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া এক নূতন সমাজ গড়িয়া তোলা ভিন্ন আর্য্যদের আর গত্যন্তর রহিল না। এই প্রচেষ্টার মধ্যেই বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের উৎপত্তির বিবরণ সন্নিবদ্ধ রহিয়াছে এবং প্রণিধানপূর্ব্বক মহাভারতের আলোচনা করিলে এই জটিল সমস্যা সংক্রান্ত অনেক কথাই বোধগম্য হয়।

মহাভারতের উৎপত্তি ও রচনাকাল সম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে বর্ত্তমানে যে অবস্থায় এই গ্রন্থ আমরা পাইয়াছি, উহা এক সময়ের রচনা নহে। ইহাতে যে কয়েকটি বিভিন্ন স্তর আছে, এবং বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময়ে রচিত হইয়া পরে একত্রে সন্নিবেশিত হইয়াছে, ইহা প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু এই স্তর নির্দ্দেশ নিতান্ত সহজসাধ্য নহে। সংক্ষেপে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতযুদ্ধ সম্বন্ধে কতকগুলি কাহিনী ও গাথা জন-সমাজে প্রচলিত ছিল। কুরু, পাঞ্চাল, কোশল প্রভৃতি অঞ্চলে ভাটেরা এই সকল গাথা গাহিয়া বেড়াইত এবং জনসাধারণের উপর ইহাদের প্রভাবও বড় অল্প ছিল না। ইহা সহজেই অনুমান করা যায় যে পুরুষানুক্রমে মুখে মুখে চলিয়া আসার ফলে এই গাথাগুলি ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্জ্জিত হইতেছিল এবং সম্ভবতঃ অনেক অবান্তর কাহিনী এইরূপে এই গাথাগুলির মধ্যে সংযোজিত হইয়াছিল। কেহ কেহ এরূপও বলিয়া থাকেন যে, যে মূল ঘটনা অবলম্বনে এই বিরাট গ্রন্থ ক্রমে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাও সম্পূর্ণরূপে অনার্য্য-সংস্পর্শ-বর্জ্জিত ছিল না। ভীমের বীভৎস রক্ত-পিপাসা, দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীবরণ প্রভৃতি কতকগুলি ব্যাপার এইরূপ অনুমানের ভিত্তি। সে যাহাই হউক, কালক্রমে এমন অবস্থা আসিল যখন ধর্ম্মের দিক হইতে এই গাথাগুলিকে আর উপেক্ষা করা চলিল না। এই পরম্পরাগত ঐতিহ্য ও আর্য্য-ধর্ম্ম বা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের প্রথম চেষ্টা ভারত-সংহিতা, অর্থাৎ মহাভারতের প্রথম স্তর।

কিন্তু শীঘ্রই আর্য্যাধিকার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইল এবং যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা মহাভারতে হইয়াছিল, তাহাই পুনরায় আরও ব্যাপকভাবে সম্পাদন করিবার প্রয়োজন

উপস্থিত হইল। এই শেষোক্ত প্রচেষ্টার ফলই বৃহত্তর মহাভারত। প্রথম স্তরে ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি বৈদিক দেবতাদিগের উপাসনারই প্রাধান্য দৃষ্ট হয়; অবতারবাদ, আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান প্রভৃতি তত্ত্বের তখনও উদ্ভব হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ এখানে একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিরূপেই চিত্রিত। সমাজে জাতিভেদপ্রথা এখনও অনেকটা শিথিল এবং স্ত্রীলোকেরা অনেকাংশেই স্বাধীন। দ্বিতীয় স্তরের সূচনা হয় সম্ভবতঃ যবন, শক প্রভৃতি বৈদেশিকগণের আবির্ভাবের পরে। বৈদিক দেবতাদিগের এখানে আর বিশেষ কোনও প্রতিষ্ঠা নাই; উহাদের স্থানে ত্রিমূর্ত্তির (অর্থাৎ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারী ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের) পরিকল্পনা এখানে সুস্পষ্ট। ইহাদের মধ্যে আবার বিষ্ণু এবং কোন কোন স্থলে শিবই প্রধান এবং উভয়েই স্বরূপতঃ পরম পুরুষ, অর্থাৎ ভগবান বলিয়াই স্বীকৃত।

কেহ কেহ অনুমান করেন যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও এই সময়েরই রচনা। প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম যখন আর কেবল আর্য্যদিগের ধর্ম্মই রহিল না, বিভিন্ন প্রকারের মতবাদ ও রীতিনীতি নিজ গণ্ডীর মধ্যে গ্রহণ করিয়া ইহা এক অভিনব আকারে পরিবর্ত্তিত হইল, তখনই নূতন পরিস্থিতির উপযোগী করিয়া ইহার প্রাচীন দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা উপলব্ধ হইল। এই প্রচেষ্টা হইতেই গীতার উৎপত্তি। গীতাকার কোনপ্রকার উপাসনাকেই একেবারে নিষ্ফল বলিয়া উপেক্ষা করেন নাই। বিভিন্ন প্রকারের দার্শনিক মতবাদ গীতাকারের হস্তে এক অপরূপ রূপে একসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। চিরন্তন বিরোধ বিস্মৃত হইয়া যেন পরস্পর পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে। সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে জ্ঞানী, যোগী, ভক্তিবাদী প্রভৃতি প্রত্যেকেই গীতাতে নিজ নিজ মতবাদেরই সমর্থন পাইয়াছেন। গীতার

সার্ব্বভৌমিকতার ইহাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। উপনিষদই গীতার ভিত্তি, কিন্তু গীতাকার বুঝিয়াছিলেন যে কেবলমাত্র যুক্তিবাদে মানবাত্মা কখনই পরিতৃপ্ত হইতে পারে না, সুতরাং গীতাতে ভক্তিবাদের উপরেই একটু বিশেষ জোর দেখিতে পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী কালে ভারতের প্রায় সকল আস্তিকবাদী সম্প্রদায়ই গীতাকে তাহাদের নিজস্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে।

সে যাহাই হউক, ইহার পরেও যে মহাভারতের কলেবর অনেকাংশে বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সে প্রসঙ্গের বিস্তৃত আলোচনার স্থান ইহা নহে। শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এই সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা যে মহাভারতের সর্ব্বত্রই সমান সফল হইযাছে এরূপ ধারণা করা সমীচীন হইবে না। অনেক সময়ে পাচকের চেষ্টা সত্ত্বেও খিচুড়ীর চাল-ডাল যেন পৃথকই রহিয়া গিয়াছে। তথাপি একথা সত্য যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশের ও বিভিন্ন জাতির সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মতবাদগুলিকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়া মহাভারত ভারতবাসীর মনে ভারতের মূলীভূত ঐক্য সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে। তাই দেখি, কি বাঙ্গালা, কি পঞ্জাব, কি দাক্ষিণাত্য সর্ব্বত্রই মহাভারত সমানভাবে আদৃত হইয়া আসিয়াছে। মহাভারত হিন্দুর পঞ্চম বেদ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে; এই ঐক্য-সাধনেই ঐ নামের সার্থকতা।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপিয়া বিভিন্ন মতবাদের ভিতরে এই ঐক্যানুসন্ধানের ফলে ভারতীয় ধর্ম্মে এক অপূর্ব্ব উদারতা ও সার্ব্ব-ভৌমিকতার উৎপত্তি হইয়াছে। এই কারণেই এখানে ধর্ম্মান্ধতা কখনই কঠিন আকারে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই এবং পরমত-সহিষ্ণুতা ভারতে একরূপ আদর্শ বলিয়া গণ্য হইয়াছে বলিলেও

অত্যুক্তি হইবে না। ভারতবর্ষ বহু সম্প্রদায় ও বিভিন্ন ধর্ম্মমতের দেশ, তথাপি এখানে ধর্ম্মযুদ্ধ বড় একটা হয় নাই। একই পরিবারে এক ভ্রাতা বৌদ্ধ, এক ভ্রাতা শৈব এবং অপরে বৈষ্ণব, অথচ সকলেই একত্রে বসবাস করিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে। ইতিহাসে আমরা দেখি যে মহারাজ অশোক বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের জন্য নিজের জীবন ও বিপুল সাম্রাজ্যের প্রায় সমস্ত ঐশ্বর্য্যই উৎসর্গ করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি ধর্ম্মান্ধতার কোন প্রকার নামগন্ধও তাঁহার নীতিতে ছিল না। তিনি সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সাধুসন্তগণের সুখ-সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন এবং অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিতেন। তিনি শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, আজীবিক ও জৈনদিগকে সমদৃষ্টিতে দেখিতেন এবং সকলেই সমানভাবে তাঁহার দানশীলতার অংশ গ্রহণ করিতেন। গয়ার ১৫ মাইল উত্তরে বরাবর গিরিতে তিনি আজীবিকদিগকে তিনটি গুহা দান করিয়াছিলেন। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান-চোয়াঙ্ ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে আমরা জানিতে পারি যে হর্ষবর্দ্ধনও বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং ব্রাহ্মণ ও জৈন সন্ন্যাসীদিগকে সমচক্ষে দেখিতেন। ইউয়ান-চোয়াঙ্ বর্ণিত দানক্ষেত্রের মহোৎসব হর্ষবর্দ্ধনের সম্প্রদায়-নিরপেক্ষতার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই উৎসব প্রতি পাঁচ বৎসরে একবার অনুষ্ঠিত হইত। বুদ্ধদেব, আদিত্য ও শিব সমভাবে ইহাতে পূজিত হইতেন এবং হর্ষ তাঁহার স্তূপীকৃত সমস্ত ঐশ্বর্য্য জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে দান করিয়া নিঃশেষ করিতেন। এরূপ আরও ছোটখাট দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ফলতঃ, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে সাধারণতঃ ভারতে ধর্ম্মবিষয়ে একটা উদার ও সার্ব্বভৌম দৃষ্টি বরাবরই লক্ষ্য করা যায়।

যুগে যুগে কত বিভিন্ন বৈদেশিক জাতি ভারতবর্ষে আসিয়া ক্রমে

হিন্দুসমাজভুক্ত হইয়া নিজেদের পৃথক সত্তা অনেকাংশে হারাইয়া ফেলিয়াছে, ইতিহাসে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ শক, গুর্জ্জর, আহোম প্রভৃতি জাতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিশেষজ্ঞরা প্রায় একবাক্যেই স্বীকার করেন যে শক, গুর্জ্জর প্রভৃতি জাতি বৈদেশিক। বিভিন্ন সময়ে ইহারা ভারতবর্ষে উপস্থিত হয়। কিন্তু কালক্রমে হিন্দুসমাজে ইহারা এমন ওতঃপ্রোতভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে ঐতিহাসিকের ও জাতিতত্ত্ববিদের বহুমুখী গবেষণার দ্বারা ইহাদের বৈদেশিকত্বের নির্ণয় করিতে হয়। এই সম্বন্ধে কয়েকটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। উত্তর-পশ্চিম ভারতের গ্রীকরাজ মিনান্দার বা মিলিন্দ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। হেলিওডোরস নামক একজন গ্রীক রাজদূত বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অদ্যাপি বেসনগরের গরুড় স্তম্ভ তাঁহার স্মৃতি বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। কুষাণ-সম্রাট্ কণিষ্ক বৌদ্ধধর্ম্মের অনুরাগী ছিলেন, কিন্তু অন্যান্য কয়েকজন কুষাণরাজ হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। শকরাজ রুদ্রদামন্ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। গুর্জ্জর বংশজাত রাজপুতগণ পরবর্ত্তীকালে হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার্থে মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আহোম জাতি শানদেশ হইতে ভারতে আসিয়া কামরূপ জয় করে এবং তথায় এক নূতন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। ইহাদের ভাষা, সামাজিক ব্যবস্থা, রীতিনীতি ও ধর্ম্মজীবনের আদর্শ হিন্দুসমাজ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারেরই ছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দুদিগের সহিত কি ভাষাগত, কি জাতিগত, কি রাষ্ট্রগত কোন প্রকারের সাদৃশ্যই ইহাদের ছিল না। কিন্তু কালপ্রভাবে ইহারাও সম্পূর্ণরূপেই হিন্দু-সমাজভুক্ত হইয়া গিয়াছে এবং ইহারা যে এককালে বিদেশ হইতে

সর্ব্বতোভাবে স্বতন্ত্র এক সভ্যতার আদর্শ লইয়া এদেশে আসিয়াছিল, তাহা ইহারা একেবারেই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে।



বেসনগরের গরুড় স্তম্ভ

কিন্তু মুসলমানদের ভারতবর্ষে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এই সমীকরণ ও সামঞ্জস্যবিধানের ধারা ব্যাহত হইল। মুসলমানেরা আসিল একটা সজীব, নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মমত লইয়া—পয়গম্বর ও কোরাণে অবিচলিত নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা লইয়া। অধিকন্তু, পূর্ব্বে যে সকল জাতি ভারতে আসিয়া ক্রমে হিন্দুসমাজে মিশিয়া গিয়াছে তাহারা তাহাদের স্বকীয় দেশ ও সমাজের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল; সুতরাং তাহাদিগকে হিন্দু সমাজের মধ্যে টানিয়া লওয়া অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু মুসলমান-গণ যুগে যুগে, প্রবাহের পর প্রবাহে ভারতবর্ষে আসিয়াছে

এবং আরব, পারস্য প্রভৃতি মুসলমান সভ্যতার বিশিষ্ট কেন্দ্রগুলি হইতে কখনই তাহাদের যোগসূত্র সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয় নাই। সুতরাং এক্ষেত্রে আর পূর্ব্বের মত একীকরণের চেষ্টা সম্ভবপর হইল না।

কিন্তু ভারতীয় প্রতিভা এই পরিস্থিতিতেও একেবারে নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকে নাই। হিন্দু এবং মুসলমানের সংঘর্ষের ফলে প্রথমে ধ্বংসের ঐকটা তাণ্ডব লীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু ক্রমে যখন মুসলমানেরা ভারতবর্ষেই স্থায়ী বসতি স্থাপন করিয়া শাসনতন্ত্র প্রণয়নে মনোযোগ দিল তখন রাজ্যশাসনের প্রয়োজনেই প্রাথমিক বিরোধিতা অনেকটা শিথিল হইয়া গেল। পক্ষান্তরে বহু হিন্দু ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করার ফলে মুসলমান সমাজও অজ্ঞাতসারে খানিকটা ভারতীয় ভাবাপন্ন হইতে বাধ্য হইল এবং ক্রমে হিন্দু ও মুসলমানের সম্মিলিত চেষ্টায় একটা নূতন সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিল। এই ঐক্যসাধনের ইতিহাসে মুসলমান পীর, ফকীর প্রভৃতি মহাজন ও হিন্দু সাধুসন্তদিগের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা প্রায় সকলেই সাধনার ক্ষেত্রে এমন একটা স্থানে পৌছিয়াছিলেন যেখানে সাম্প্রদায়িকতার নামগন্ধও ছিল না, মানুষের তথা মানবধর্ম্মের মৌলিক একত্বই যেখানে প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছিল। এই সার্ব্বভৌম ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া ইঁহারা হিন্দুকে বলিলেন প্রকৃত হিন্দু হইতে এবং মুসলমানকে বলিলেন প্রকৃত মুসলমান হইতে। আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মের বিধি-নিষেধ অতিক্রম করিয়া মূল তত্ত্বের দিকেই ইঁহারা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিলেন। ফলে, সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত বিদ্বেষ অনেকাংশে দূরীভূত হইয়া শান্তিপ্রদ, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এক নূতন আবহাওয়ার সৃষ্টি হইল।

সম্রাট্ আকবরের রাজত্বকালে এই আবহাওয়ার প্রভাব আমরা

রাজনীতি ক্ষেত্রেও দেখিতে পাই। জিজিয়া ও তীর্থ-কর রদ্, শাসন-তন্ত্রে ও সামরিক বিভাগে হিন্দুদিগের উচ্চ পদ সমূহে নিয়োগ প্রভৃতি ব্যবস্থা হইতে ইহা সহজেই অনুমিত হয়। ধর্ম্ম জগতেও মহামতি আকবর এক নূতন পন্থা প্রণয়নের চেষ্টা করেন। ফতেপুর সিক্রিতে তাঁহার 'ইবাদৎখানা' নামক উপাসনা গৃহে প্রথমে তিনি ইস্‌লাম ধর্ম্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণকে একত্রিত করিয়া তাঁহাদের বিচার-বিতর্ক শ্রবণ করিতেন। পরে হিন্দু, জৈন, পার্শী, খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্ম্মের প্রতিনিধিগণও তথায় আমন্ত্রিত হইলেন এবং নিজ নিজ ধর্ম্মের ব্যাখ্যা সম্রাট্‌কে শুনাইতে লাগিলেন। এই সকল আলোচনার ফলে আকবর যেন এক নূতন তথ্যের সন্ধান পাইলেন এবং 'দীন ইলাহি' নামক এক নূতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিতে অগ্রসর হইলেন। সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের প্রচেষ্টায় বিবিধ ধর্ম্মের মূল তত্ত্বগুলির একটা সামঞ্জস্য করিয়া এই নূতন ধর্ম্ম গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু ভারতে ধর্ম্মগত ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য আকবরের এই চেষ্টা ফলপ্রসূ হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এই নবপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। হয়ত এই ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের অন্তরালে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই ছিল মুখ্য, সুতরাং ধর্ম্ম হিসাবে এই নূতন মত প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে ইহাও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েই সাধারণতঃ নিজ নিজ ধর্ম্মে এরূপ বিশ্বাসবান্ ও শ্রদ্ধাশীল ছিল যে এক পক্ষকে অপরের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করা কিংবা উভয়কেই ধর্ম্মান্তরে দীক্ষিত করা, ইহার কোন প্রচেষ্টাই সার্থক হইবার সম্ভাবনা ছিল না। আকবর চাহিলেন হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই এক নূতন ধর্ম্মে লইয়া যাইতে, আর ঔরংজীব চাহিলেন ভারতবর্ষে ইস্‌লাম ধর্ম্মের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা

করিতে; উভয় প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইল। কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান সাধুসন্তগণ যে পন্থা প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা ব্যাপকভাবেই কার্য্যকরী হইয়া আসিয়াছে। তাঁহারা দেখাইয়াছিলেন যে বিভিন্ন ধর্ম্মের গৌণ বিষয়গুলি আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী মনে হইলেও মুখ্যতঃ এবং মূলতঃ সকল ধর্ম্মই এক তত্ত্ব প্রচার করিয়া থাকে এবং সেই মূল তত্ত্বে দৃষ্টি রাখিলে অনুষ্ঠানাদির পার্থক্য সত্ত্বেও পরস্পরের প্রতি একটা শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। প্রধানতঃ এই শিক্ষার ফলেই হিন্দু এবং মুসলমান বহুকাল যাবৎ শান্তিতে ও নির্ব্বিঘ্নে পাশাপাশি বসবাস করিয়া আসিতেছিল এবং এই শিক্ষা বিস্মৃত হইয়াই বর্ত্তমানে উভয় সম্প্রদায়ের কোন কোন অংশ আত্মঘাতী কলহের উন্মাদনায় মাতিয়াছে।

সুতরাং ইহা নিশ্চিত যে ভারতীয় ধর্ম্মের ইতিহাসে এই সমীকরণ ও ঐক্যসাধনের প্রচেষ্টা একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। যুগে যুগে ভারতীয় ধর্ম্ম অভিনব ভাবধারা ও পরিবেষ্টনীর প্রতিক্রিয়ায় অভিনব রূপ ধারণ করিয়াছে। পক্ষান্তরে ইহাও বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য যে বিভিন্ন যুগে বহুবার এই ধর্ম্ম ক্রমশঃ প্রাণের সহিত সম্পর্ক হারাইয়া কেবলমাত্র শুষ্ক আচার-বিচার ও কতকগুলি অর্থহীন অনুষ্ঠানে পর্য্যবসিত হইতে হইতেও বাঁচিয়া গিয়াছে। কি ব্যক্তিগত, কি জাতিগত জীবনে ধর্ম্মের দুর্দ্দিন তখনই উপস্থিত হয় যখন ইহা কেবল কতকগুলি আচার, নিয়ম ও বিধি-নিষেধেরই নামান্তর হইয়া দাঁড়ায়, আধ্যাত্মিক ও মানসিক জীবনের সহিত ইহার আর কোনও সম্পর্ক থাকে না। বিধি-নিষেধ অল্পাধিক সকল ধর্ম্মেই আছে, কিন্তু এই বিধি-নিষেধগুলি ধর্ম্ম নহে, ধর্ম্মলাভের উপায় মাত্র। কিন্তু এমন সময় আসে যখন এই উপায়গুলিই ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়া বসে, ইহাদের

চাপে প্রকৃত প্রাণধর্ম্মের কণ্ঠরোধ হয়। একটা উদাহরণ দিলেই কথাটা পরিস্ফুট হইবে। তীর্থযাত্রার ব্যবস্থা প্রায় সকল ধর্ম্মেই আছে। তীর্থস্থানের বিশুদ্ধ আবহাওয়ার সংস্পর্শে আসিয়া মনে ধর্ম্মভাব জাগরিত করিয়া তোলাই যে ইহার প্রধান উদ্দেশ্য তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু কালক্রমে এই অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের কথা লোকে ভুলিয়া যায়, তীর্থদর্শন ব্যাপারটাই মুখ্য হইয়া পড়ে। আবার বিভিন্ন ধর্ম্মে নানাপ্রকার সংযম ও নিয়মাদির ব্যবস্থা ধর্ম্মসাধনের সাহায্য কল্পেই প্রবর্ত্তিত হয়, কিন্তু ক্রমে শুধু এই নিয়মপালনই ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায়; এগুলি যে অপ্রধান এবং গৌণ, সে কথা বিস্মৃত হইয়া মানুষ আনুষ্ঠানিক আচার-নিয়মেই আবদ্ধ হইয়া পড়ে। এইরূপ ধর্ম্ম-সঙ্কট ভারতের ইতিহাসে বহুবার উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে প্রতিবারই ধর্ম্মজগতে শক্তিশালী মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হইয়া ভারতের জনসাধারণের দৃষ্টি ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট করিয়া ধর্ম্মকে উজ্জীবিত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্য, কবীর, নানক প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকল মহাপুরুষ যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়া ভারতে ধর্ম্মসম্বন্ধে উদারতার বন্যা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিলেন এবং দেশবাসীর সংস্কার-সঙ্কীর্ণ বুদ্ধিকে মুক্ত করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে ইহাই ভারতীয় ধর্ম্মের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য।

ভারতীয় ধর্ম্মের ধারাবাহিক ইতিহাসে প্রথমেই বৈদিক ধর্ম্মের স্থান। চারি বেদের মধ্যে ঋগ্বেদই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও আদিম বৈদিক ভাবধারার সর্ব্বপ্রধান আশ্রয়। সামবেদের অধিকাংশ গাথাই ঋগ্বেদে পাওয়া যায় এবং যে সকল অংশ ইহার নিজস্ব সেখানেও নূতন শিক্ষা বিশেষ কিছুই নাই। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে যজ্ঞস্থলে গীত হইবার

জন্যই এই গাথাগুলি সামবেদে একটা বিশিষ্ট প্রকরণে নিবদ্ধ হইয়াছিল। যজ্ঞাদির সময় বিবিধ আচার-নিয়মের সঠিক অনুষ্ঠান যাহাতে হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই যজুর্ব্বেদ গ্রথিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। সুতরাং বৈদিক ধর্ম্মের মূল ভাবধারার সহিত পরিচিত হইতে হইলে ঋগ্বেদের আলোচনাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।

ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলির প্রকৃত তাৎপর্য্য কি তাহা লইয়া পণ্ডিত সমাজে অনেক মতভেদ আছে। তবে এই মতভেদের মূল কারণ বোধ হয় ইহাই যে ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি এক সময়ের রচনা নহে এবং মহাভারতের ন্যায় ঋগ্বেদেও বিভিন্ন স্তর বিভাগ আছে। বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ভাবধারার বিকাশই স্বাভাবিক, সুতরাং ঋগ্বেদকে একই সময়ে রচিত মন্ত্রসমূহের পূর্ণাবয়ব সঙ্কলন হিসাবে বিচার করিতে গেলে মতভেদ অনিবার্য্য হইয়াই উঠিবে। সে যাহাই হউক, ঋগ্বেদে আমরা প্রধানতঃ বিভিন্ন দেবদেবীর অনুবর্ত্তিতায় প্রকৃতির উপাসনাই দেখিতে পাই। বরুণ, মিত্র, সূর্য্য, অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি বৈদিক দেবতাগণ এক একটি প্রাকৃতিক শক্তির প্রতীক এবং প্রাকৃতিক শক্তিতে দেবত্ব আরোপের ফলেই যে ইঁহাদের উৎপত্তি, তাহা এক প্রকার নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে। প্রথম যুগে প্রার্থনাই উপাসনার প্রধান অবলম্বন এবং শ্রদ্ধাই উহার মূল ভিত্তি। দ্বিতীয় যুগে আমরা দেখি যাগ, যজ্ঞ, হোম প্রভৃতির প্রচলন এবং নৈবেদ্য ও অর্ঘ্যাদির প্রাবল্য। এই যুগে পশুবলিও প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই সকল যাগ-যজ্ঞাদিতেও যে শ্রদ্ধাই প্রধান এবং শ্রদ্ধাহীন অনুষ্ঠানের যে বিশেষ কোনও মূল্য নাই, এই শিক্ষাও সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছে। কালক্রমে এই যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতির প্রকৃত তাৎপর্য্য লোকে অনেকটা বিস্মৃত হইয়া গেল। বাহ্যিক অনুষ্ঠান ও

আড়ম্বরই শ্রদ্ধার স্থান অধিকার করিয়া বসিল এবং পুরোহিত সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব অতিমাত্রায় বাড়িয়া গেল। বৈদিক ধর্ম্মের এই অনুষ্ঠান-বহুল অবস্থা 'ব্রাহ্মণ' নামে পরিচিত গ্রন্থসমূহে স্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। এই শুষ্ক, প্রাণহীন, আচারবহুল ধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আমরা পাই প্রথমে উপনিষদে ও পরে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মে।

উপনিষদের মূল কথা ব্রহ্মবাদ ও আত্মজ্ঞান। এই বিশ্ব এক মহাসত্যকে অবলম্বন করিয়াই অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই বিভিন্নমুখী ও পরস্পর বিরোধী ভাব দ্বারা বিপ্লুত, হিংসা-দ্বেষ জর্জ্জরিত জগৎ-সংসারের অন্তরালে রহিয়াছে এক মহাসত্য, এক মহা ঐক্য; এই সত্যানুসন্ধান বা ঐক্যানুসন্ধানই প্রকৃত ধর্ম্ম। দ্বন্দ্ববুদ্ধি অবিদ্যা বা অজ্ঞানপ্রসূত, ঐক্যবুদ্ধিই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। ঐক্যের পথে অগ্রসর হইতে হইতে সুখদুঃখ, ভালমন্দ, শুভাশুভ প্রভৃতি দ্বন্দ্ববুদ্ধিজাত অনুভূতিগুলি আপনা হইতেই অপসৃত হইয়া যায় এবং মানুষ মঙ্গলময়, সর্ব্বদুঃখহর, মহাকল্যাণময় এক অপূর্ব্ব সত্যের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই সত্যই ব্রহ্ম এবং সচ্চিদানন্দই তাঁহার স্বরূপ। এই সত্যলাভের জন্য বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নিতান্তই গৌণ।

উপনিষদের এই মহান্ শিক্ষা ও উচ্চাদর্শের প্রভাবে বৈদিক যাগ-যজ্ঞ, হোম প্রভৃতির প্রাবল্য অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু তৎকালীন সমাজে এই অনুষ্ঠানগুলি এমন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল এবং পুরোহিত সমাজের স্বার্থ ইহাদের সহিত এমন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল যে ইহাদের মূলোৎপাটন হইল না। ইহাদের বিরুদ্ধে উপনিষদের পরবর্ত্তী যুগে আরও তীব্রতর প্রতিবাদ লইয়া উপস্থিত হইলেন মহাবীর ও বুদ্ধ। এই দুই মহাপুরুষের আবির্ভাবের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই ভারতের ভাবজগতে এক বিপ্লব উপস্থিত

হইয়াছিল। এই বিপ্লবের ইতিহাস এখনও সম্পূর্ণরূপে সংগৃহীত হয় নাই, তথাপি ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে এই যুগ ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক অপূর্ব্ব স্বাধীন চিন্তা ও অনুসন্ধিৎসার যুগ। উপনিষদে আমরা যে স্বাধীন মনোবৃত্তির পরিচয় পাই, তাহাই এখন পুরাতনের সকল গণ্ডী অতিক্রম করিয়া ভাবজগতে এক অরাজকতার সৃষ্টি করিয়া তুলিল। বেদের প্রামাণিকতা, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকাণ্ড, উপনিষদের অধ্যাত্মবাদ—যুক্তিবাদের আক্রমণ হইতে ইহার কিছুই নিস্তার পাইল না। জড়বাদী চার্ব্বাকপন্থীরা বলিতে লাগিল, পঞ্চেন্দ্রিয় অনুভূত যে জ্ঞান তাহাই একমাত্র প্রমাণ, মৃত্যুর পর আর কিছুই থাকিতে পারে না, সুতরাং "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ"। আত্মা, ভগবান, পরকাল প্রভৃতি নিছক কল্পনা মাত্র। উহাদের অস্তিত্বের কোন প্রমাণই নাই। স্মরণ রাখিতে হইবে যে এই বৈপ্লবিক পরিস্থিতির মধ্যেই জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছিল। একদিকে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড ও পশুবলি প্রভৃতির উৎকট আড়ম্বর, অপরদিকে উপনিষদের অধ্যাত্মবাদের নানাপ্রকার খামখেয়ালী অপব্যাখ্যা, সর্ব্বোপরি জাতি-ভেদের কঠোরতা ধর্ম্মজগতে এক ভয়াবহ অবস্থার সূচনা করিয়াছিল। এই দুর্দ্দিনেই মহাবীর ও বুদ্ধ আবির্ভূত হইলেন।

ইঁহারা উভয়েই বেদের প্রামাণিকতা অস্বীকার করিলেন, পশুবলি প্রভৃতি অনাবশ্যক অনুষ্ঠানগুলির নিরোধকল্পে অহিংসা রূপ মহামন্ত্র প্রচার করিলেন এবং অধ্যাত্মবাদের জটিল প্রশ্নগুলি কৌশলে এড়াইয়া গেলেন। ইঁহাদের উভয়েরই প্রচেষ্টা হইল একটা সুন্দর, সুষ্ঠু নৈতিক জীবনের আদর্শ গড়িয়া তোলা। বিশেষজ্ঞরা বলেন যে মহাবীরেরও পূর্ব্বে পার্শ্বনাথই জৈনধর্ম্মের প্রথম সূচনা করেন। তাঁহার উপদেশের সার ছিল—জীবে হিংসা না করা, মিথ্যা না বলা, চুরি না করা এবং

পরের দ্রব্য গ্রহণ না করা। মহাবীর ইহার সহিত আর একটি বিধি যোগ করিয়া দিলেন, তাহা হইল জিতেন্দ্রিয় থাকিবার সঙ্কল্প। বুদ্ধদেবও অধ্যাত্মবাদের কূটতর্কগুলি সযত্নে পরিহার করিয়া এক উচ্চতর নৈতিক জীবনের আদর্শই নির্দ্দেশ করিলেন। বুদ্ধদেব প্রচারিত ধর্ম্মে সর্ব্ব প্রকারে সদ্ভাবে জীবনযাত্রার উপরই বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে।

মহাবীর ও বুদ্ধ উভয়েই কর্ম্মবাদে বিশ্বাসী। জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলই মানুষের দুঃখ কষ্টের মূল এবং সদ্ভাবে জীবন যাপন করিতে করিতে মানুষ ক্রমে এই কর্ম্মচক্র হইতে উদ্ধার পাইয়া নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারে। জগৎ দুঃখময় এবং ইহা হইতে নিষ্কৃতি লাভের একমাত্র উপায় সত্যানুশীলন। এই সত্যানুশীলন সম্পর্কে মহাবীর উপদেশ করিলেন কঠোর কৃচ্ছ্র সাধন। কিন্তু বুদ্ধদেব বুঝাইলেন যে উচ্ছৃঙ্খলতা বা উৎকট সংযম, এই উভয়বিধ আতিশয্যই ক্ষতিকারক, মধ্যপন্থাই শ্রেয়। পক্ষান্তরে, জন্মগত জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে বুদ্ধদেব যেরূপ কঠোর ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন, জৈন ধর্ম্মে ততটা তীব্রতা দৃষ্ট হয় না।

সে যাহাই হউক, প্রধানতঃ এই দুই মহাপুরুষের চেষ্টায় ভারতের ধর্ম্ম জীবনে এক নূতন যুগের সূচনা হইল। বৌদ্ধ সঙ্ঘ ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিতে লাগিল, স্থানে স্থানে বৌদ্ধ বিহার গড়িয়া উঠিল, এবং বৌদ্ধ ভীক্ষু ও জৈন সন্ন্যাসীদের শিক্ষায় ও আদর্শে দেশে একটা কল্যাণকর আবহাওয়ার সৃষ্টি হইল। মৌর্য্য সম্রাট্ অশোকের চেষ্টায় বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল এবং ভারতবর্ষের বাহিরেও ইহার প্রভাব ছড়াইয়া পড়িল। সম্রাট্ অশোকের শিক্ষায়ও আমরা শুধু একটা উন্নততর নৈতিক জীবনের আদর্শই পাই, আর পাই সংসার-বিরক্তি, ত্যাগ ও সঙ্ঘ জীবনের আদর্শ। কিন্তু এই শুষ্ক নৈতিক বিধি-নিষেধ ও সর্ব্বাঙ্গীন ত্যাগের আদর্শ মানুষের অন্তর্নিহিত

হৃদয়াবেগ অধিক কাল পরিতৃপ্ত করিতে পারিল না। ভক্তি ও শরণাগতি মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি এবং যে কোন প্রকারের অধ্যাত্মবাদও তাহার পক্ষে প্রায় অপরিহার্য্য। সুতরাং এই বেদবিরোধী নাস্তিক মতবাদ কেবল মাত্র একটা উন্নত নৈতিক আদর্শের জোরে সর্ব্বতোভাবে ভারতবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিল না। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত সম্বন্ধচ্যুত হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম যেন দুঃখনিবৃত্তির নামে ক্রমে এক আত্মবিনাশের আদর্শ আনিয়া উপস্থিত কবিল। ইহারই অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ার ফলে অশোকের পরবর্ত্তী যুগে ভক্তিমূলক সাধনার প্রবৃত্তিকে নিরোধ করিতে না পারিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম নিজেই ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল এবং প্রধানতঃ ভাগবত ধর্ম্মের চেষ্টায় উপনিষদাদির ভিত্তিতে আস্তিক্যবাদ ভারতবর্ষে পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তি ও প্রচার এবং গীতোক্ত ভাগবত ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, এই দুইটিই এই নূতন যুগের প্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয়।

অনুরাগ ও আনন্দের প্রয়োজনেই বৌদ্ধ ধর্ম্ম তাহার প্রাচীন, নীরস, বিধি-নিষেধাত্মক পন্থা ছাড়িয়া এক নূতন প্রেরণায় সঞ্জীবিত হইতে চাহিল। বুদ্ধদেব ভগবানে রূপান্তরিত হইলেন, নানা স্থানে মন্দির নির্ম্মিত হইয়া বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল এবং যথোচিত উপাসনা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইল। এই নূতন মতবাদের সমর্থনে নূতন দর্শনশাস্ত্র গড়িয়া উঠিল এবং প্রাচীন বৈরাগ্যের আদর্শ অনেকাংশে শিথিল হইয়া গেল। ভগবান, আত্মা, পরমার্থ প্রভৃতি বিষয়গুলিও আস্তিক্যবাদের আদর্শেই ব্যাখ্যাত হইল। কুষাণ সম্রাট্ কণিষ্কের সময়ে এই মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং ক্রমে সমগ্র উত্তর ভারতে ইহা ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়ে। অন্যদিকে হিন্দু

ধর্ম্মের মহারথীরাও নিশ্চেষ্ট বসিয়া রহিলেন না। নিরীশ্বর বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতবাসীর মনে যে বিপ্লবের সঞ্চার করিল তাহারই প্রতিক্রিয়ায় শৈব ও ভাগবত ধর্ম্ম শক্তিশালী হইয়া উঠিল। এই দুই ধর্ম্মের একটা অপরিণত অবস্থা হয়ত বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগেও খুঁজিয়া পাওয়া যায়, কিন্তু অশোকের পরবর্ত্তী কালেই ইহারা ব্যাপকভাবে কার্য্যকরী হইতে আরম্ভ করে। ইহাদের মধ্যে আবার ভাগবত ধর্ম্মই অধিকতর প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ভাগবত ধর্ম্মের উৎপত্তির বিষয় লইয়া বহু মতভেদ আছে এবং সহজে এই প্রশ্নের মীমাংসা হইবার নহে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে প্রথমে কৃষ্ণ-বাসুদেবকে অবলম্বন করিয়া যে একেশ্বরবাদ গড়িয়া উঠে তাহা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের আওতার বাহিরেই হয় এবং এই যুগে এই ধর্ম্ম অনেকাংশে বেদবিরোধীই ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ ইহা এত জনপ্রিয় হইয়া উঠিল যে ব্রাহ্মণেরা আর ইহাকে অবহেলা করিতে পারিলেন না। পরে শ্রীকৃষ্ণ বৈদিক দেবতা বিষ্ণুর সহিত একীকৃত হইয়া পরম পুরুষ শ্রীভগবান রূপে স্বীকৃত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে অবতারবাদও প্রচারিত হইল। মহাভারতে ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ভগবান রূপেই সুপ্রতিষ্ঠিত। ভাগবত ধর্ম্মের মূল কথা একেশ্বরবাদ এবং ভক্তিবাদ। এই ভক্তিমূলক একেশ্বরবাদের সহিত উপনিষদের চরম তত্ত্বগুলির সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টাই গীতাতে দৃষ্ট হয়। সে যাহাই হউক, এই সময় হইতেই ভাগবত ধর্ম্মের প্রভাব উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের আমলে এই ধর্ম্ম ভারতের ধর্ম্মজগতে সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়া বসে। গুপ্ত সম্রাট্‌গণ প্রায় সকলেই "পরম ভাগবত" বলিয়া আপনাদিগকে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বলীয়ান হইয়া ভাগবত ধর্ম্ম ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই

বিস্তৃত হইয়া পড়ে। গুপ্ত আমলেই পুরাণগুলির অধিকাংশ রচিত হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। এই গ্রন্থগুলিতে, বিশেষতঃ ভাগবত পুরাণে, ভাগবত ধর্ম্মের নূতন বাখ্যা পাওয়া যায়।

ইহার পরবর্ত্তী কালের ইতিহাস অনেকটা অস্পষ্ট ও তমসাচ্ছন্ন। তাহা হইলেও সংক্ষেপে এইরূপ বুঝিতে পারা যায় যে মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও হিন্দু ধর্ম্ম পরস্পরের ঘাত-প্রতিঘাতে ক্রমশঃ বিকৃত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া এমন এক অবস্থায় আসিল যে উভয়ের মধ্যগত পার্থক্য অনেকাংশে বিদূরিত হইয়া গেল। হিন্দুরা বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল এবং বৌদ্ধেরা বিষ্ণুকে বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণির সহিত অভিন্ন বলিয়া প্রচার করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অন্যান্য দেবদেবীও মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম্মে ধীরে ধীরে স্বীকৃত হইলেন। বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও দর্শন ক্রমশঃ হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া এমন এক অবস্থায় আসিল যে বৌদ্ধ ধর্ম্মকে বৈষ্ণব ধর্ম্মেরই একটি শাখারূপে গণনা করিবার কারণ উপস্থিত হইল। ক্রমে এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের আর কোন বৈশিষ্ট্যই রহিল না। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন ও পালরাজগণের আমলে প্রচলিত বৌদ্ধ ধর্ম্মে আমরা এই পরিবর্ত্তিত আকারই দেখিতে পাই। ইহার যাহা অবশ্যম্ভাবী পরিণতি তাহাই হইল। কালক্রমে বৌদ্ধ মন্দিরাদি হিন্দু আদর্শে রূপান্তরিত হইল, বৌদ্ধ ধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্মের বিরাট গহ্বরে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতির যুগে ইহার মধ্যে নানা প্রকারের সম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়া ইহার অবস্থা আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছিল। বিশেষতঃ বৌদ্ধ তান্ত্রিকেরা নানাবিধ গুহ্য সাধনার উৎকট ব্যাভিচারে সমগ্র দেশকে উত্যক্ত করিয়া তুলিল। হিন্দুসমাজও বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের ফলে এমন এক অবস্থায় আসিয়া পড়িল যে ইহার

নিজ আদর্শগুলি বিকৃত হইয়া গেল। মূল ভিত্তি হইতে বিচ্যুত হইয়া হিন্দু ধর্ম্মও নিতান্ত প্রাণহীন ও কুসংস্কারাপন্ন হইয়া দাঁড়াইল। এই ভাব-সঙ্কর ও ধর্ম্ম-সঙ্করের যুগে নূতন বার্ত্তা লইয়া উপস্থিত হইলেন শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য। তিনি উপনিষদ, গীতা ও বেদান্তদর্শনের ভিত্তিতে অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ প্রচার করিয়া হিন্দু সমাজের অর্দ্ধমৃত দেহে পুনরায় প্রাণ সঞ্চার করিলেন। কুসংস্কার ও ভাব-বিপর্য্যয়ের জটিল আবর্ত্ত অতিক্রম করিয়া হিন্দু ধর্ম্ম পুনরায় সহজ পথে অগ্রসর হইল।

কিন্তু শঙ্করের এই অদ্বৈত ব্রহ্মবাদে বৈষ্ণবেরা সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। জীব ও ব্রহ্মের অনন্যতা যেন তাহাদের ধর্ম্মের মূলেই কুঠারাঘাত করিয়া বসিল। ভক্ত ও ভগবান পৃথকভাবে পরিকল্পিত না হইলে ভক্তি সাধনার কোন সার্থকতাই থাকে না, সুতরাং শঙ্করাচার্য্য প্রবর্ত্তিত অদ্বৈত ব্রহ্মবাদের প্রতিবাদে বৈষ্ণব দার্শনিকগণ বৈষ্ণব ধর্ম্মের সমর্থনে বেদান্তসূত্রের নানাপ্রকারের ভাষ্য প্রচার করিলেন। ইহাদের মধ্যে রামানুজ প্রবর্ত্তিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার সময় হইতেই ভাগবত ধর্ম্ম বা বৈষ্ণব ধর্ম্ম সুদৃঢ় দার্শনিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইল।

ভারতে ধর্ম্মের ইতিহাসে ইহার পরবর্ত্তী কালের সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা মধ্য যুগের ধর্ম্মবিপ্লব। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকেই মুসলমানগণ সিন্ধুদেশ জয় করে, একাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মুলতান প্রদেশ ও পঞ্জাবের শাহিরাজ্য স্থায়ীভাবে তাহাদের করতলগত হয়, এবং দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দশক ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে সমগ্র উত্তর ভারতে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমে তাহাদের অধিকার দাক্ষিণাত্যেও বিস্তৃত হয়। রাষ্ট্রীয় জীবনের এই বিপর্য্যয় হিন্দুদিগের সামাজিক ও ধর্ম্মগত জীবনেও এক বিপ্লব উপস্থিত করিল। মুসলমান

আমলের প্রথম ভাগে পরস্পরের আত্যন্তিক বিরোধিতা ও অসহনশীলতার ফলে এক দুর্ব্বহ পরিস্থিতির উদ্ভব হইল। ইস্‌লাম ধর্ম্মের একেশ্বরবাদ ও প্রতিমা-পূজার প্রতি আপোষবিহীন তীব্র মনোভাব হিন্দুদিগের সমূহ বিপদের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। মুসলমান সমাজের সাম্যের আদর্শ জাতিভেদ-প্রপীড়িত হিন্দুসমাজে বিক্ষোভের সৃষ্টি করিল। নানাস্থানে বহু মন্দির ধূলিসাৎ হইয়া মস্‌জিদে পরিণত হইল এবং দলে দলে হিন্দু ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল। হিন্দুসমাজ প্রমাদ গণিল।

কিন্তু এই চরম অবস্থা অধিককাল স্থায়ী হইতে পারিল না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রধানতঃ রাজ্যশাসনের প্রয়োজনেই এই অনমনীয় মনোভাব অনেকাংশে শিথিল হইয়া গেল। তাই আমরা দেখি, যে সুল্‌তান মামুদ বহু মন্দির বিধ্বস্ত করিয়া হিন্দুদিগের প্রাণে আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনিও তাহার প্রচলিত মুদ্রায় আল্লাহ্‌ শব্দের অনুবাদে "অব্যক্ত" ও রসুল শব্দের অনুবাদে "অবতার" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। যাঁহারা মুদ্রা-বিদ্যার সম্যক আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা প্রায় একবাক্যে সকলেই বলেন যে মুসলমান সুল্‌তানগণ তাঁহাদের প্রচলিত মুদ্রায় হিন্দুদিগের অনেক সাঙ্কেতিক নিদর্শন নির্ব্বিচারে ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। সে যাহাই হউক, ক্রমে মুসলমান রাজনৈতিকেরা বুঝিতে পারিলেন যে হিন্দুদিগের আনুকূল্য ও সাহায্য ব্যতীত রাজ্যশাসন তাঁহাদের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব। এই ভাবেই ক্রমে ক্রমে উভয় সম্প্রদায় পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল এবং এই নূতন পরিস্থিতির প্রয়োজনের তাগিদেই ধীরে ধীরে উভয়ের সম্মিলিত চেষ্টায় এক নূতন সভ্যতা গড়িয়া উঠিল। এই যুগের ভাষা, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতির আলোচনা করিলে এই সত্য সহজেই উপলব্ধ হয়।

এই পারস্পরিক আদান-প্রদান ধর্ম্মজগতেও এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিল এবং ইহাই মধ্য যুগের ধর্ম্ম বিপ্লবের গোড়ার কথা। তবে এ কথাও বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে পঞ্চদশ শতাব্দীতে কি রাষ্ট্রিক, কি সামাজিক, কি ধর্ম্মজীবনে ভারতবর্ষে এক মহা দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছিল। তৈমুরলঙ্গের আক্রমণের পর হইতেই দিল্লীর সুল্‌তানগণের প্রভাব বিনষ্ট হইয়া যায় এবং মুঘল যুগের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত রাজশক্তি অল্পাধিক পরিমাণে দুর্ব্বল হস্তেই পরিচালিত হয়। এই সময়ে অনেকগুলি খণ্ডরাজ্যের উদ্ভব হয় এবং ইহাদের পারস্পরিক কলহে ও বৈদেশিক আক্রমণে সমগ্র দেশময় একটা অশান্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসের ন্যায় এই যুগের ঘটনাবলীও হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের পক্ষেই নিতান্ত লজ্জাকর সন্দেহ নাই। সে যাহাই হউক, এই সময়ের তথাকথিত ধর্ম্মজীবনের ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই নিজ নিজ ধর্ম্মের আদর্শ ও মূলগত তত্ত্বগুলি সম্যক্‌রূপে বিস্মৃত হইয়া আনুষ্ঠানিক বাহ্যাড়ম্বরেই আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। হিন্দুরা কঠোর জাতিভেদের প্রথাকে কঠোরতর করিয়া, বিধি-নিষেধের গণ্ডী অতিমাত্রায় বাড়াইয়া দিয়া আত্মরক্ষায় চেষ্টিত হইল। কিন্তু এই পন্থায় বিশেষ কোনও উপকার হইল না। এই সঙ্কট-কালেই মধ্য যুগের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব প্রচার করিয়া ভারতবাসীকে পুনরায় স্বধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন।

এই যুগ প্রবর্ত্তকদিগের মধ্যে রামানন্দের স্থানই সর্ব্বাগ্রে। ইনি প্রথমে রামানুজাচার্য্য প্রবর্ত্তিত শ্রীসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু সেই সম্প্রদায়ের অতিমাত্রায় কঠোর কোনও নিয়ম ভঙ্গের অপরাধে তিনি তথা হইতে বিতাড়িত হন এবং কাশীতে আসিয়া স্থায়ীভাবে বাস

করিতে থাকেন। ক্রমে তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাব চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং বহুলোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। কথিত আছে যে বিখ্যাত সাধু ও ধর্ম্মবেত্তা কবীর তাঁহারই শিষ্য ছিলেন। রামানন্দ প্রচার করিলেন যে প্রকৃত ভগবদ্ভক্তিই ধর্ম্মজীবনের ভিত্তি, এবং প্রকৃত জ্ঞান যাহার জন্মিয়াছে সামাজিক বিধি-নিষেধ তাহার সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। তিনি জাতিনির্ব্বিশেষে শিষ্য সংগ্রহ করিলেন এবং ক্রিয়াবহুল আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সহজ, সরল নামবাদ প্রচার করিলেন। তাঁহার মতে ভক্তি সহকারে একাগ্র চিত্তে ভগবানের নামোচ্চারণই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। রামানন্দের ধর্ম্মময় জীবনের আদর্শ এবং সরল মতবাদ প্রচারের ফলে দেশে একটা সর্ব্বাঙ্গীন উদার ও সহনশীল মনোভাবের উৎপত্তি হইল।

রামানন্দের পরবর্ত্তীদিগের মধ্যে যুক্ত-প্রদেশে কবীর, পঞ্জাবে গুরু নানক, বাঙ্গালায় শ্রীচৈতন্য ও আসামে শঙ্করদেবের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাহ্যতঃ ইঁহাদিগের প্রচারিত মতবাদে অনেক পার্থক্য দৃষ্ট হইলেও মূলতঃ ইঁহারা সকলেই প্রায় এক কথাই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। অন্তরের পবিত্রতা ও অবিমিশ্র ভক্তি সাধনাই ইঁহাদের মতে প্রকৃত ধর্ম্ম লাভের একমাত্র উপায়। ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তিই ধর্ম্ম জীবনের ভিত্তি এবং নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের নামোচ্চারণই শ্রেষ্ঠ সাধনা। আচারবহুল আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম মানুষকে শুধু উত্তরোত্তর আবদ্ধই করিয়া থাকে, তাঁহাকে মুক্তির বার্ত্তা দিতে পারে না। জীবের দুঃখ দুর্দ্দশার প্রধান কারণই অহংজ্ঞান এবং অহংজ্ঞান হইতে মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় ভগবানে আত্মসমর্পণ।

মধ্য যুগের এই বিরাট ধর্ম্মবিপ্লবের বিস্তারিত বিবরণ দিবার স্থান এখানে নাই, শুধু ইহার দুই একটি বৈশিষ্ট্যের কথাই সংক্ষেপে বিবৃত

হইল। বুদ্ধদেবের সময় হইতেই ভারতীয় ধর্ম্মে বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসের উপর একটা অত্যধিক জোর দেওয়া হইয়াছিল। পরবর্ত্তী সংস্কারকদিগের শিক্ষার ফলেও এই আদর্শ ক্ষুণ্ণ না হইয়া বরং সম্মানিত হইয়াই আসিতেছিল। অগণিত সন্ন্যাসী সম্প্রদায় এই দেশকে প্রপীড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। মধ্য যুগে, বিশেষতঃ গুরু নানক প্রবর্ত্তিত শিখ ধর্ম্মে, সন্ন্যাসের প্রতি এই অনুরক্তির আতিশয্য বহুল পরিমাণে কমিয়া গেল এবং গার্হস্থ্যাশ্রমই যে সকল আশ্রমের ভিত্তি, এই শিক্ষা পুনরায় প্রবর্ত্তিত হইল। জীবিকা নির্ব্বাহের উপযোগী সাংসারিক বৃত্তিগুলির মধ্যে অগৌরবের কিছুই নাই, বরং ভগবানে চিত্ত স্থির রাখিয়া সংসারধর্ম্ম পালন সন্ন্যাস অপেক্ষাও উচ্চতর সাধনা, এই শিক্ষায় ভারতবাসী নূতনভাবে অনুপ্রাণিত হইল। আর ইঁহারা দিলেন প্রেমের শিক্ষা, আনন্দের বার্ত্তা। এই বিশ্বচরাচর আনন্দেই অধিষ্ঠিত, আনন্দসূত্রেই গ্রথিত। এই মূল সূত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াই মানুষ দুঃখ ভোগ করে, এই জগৎকে দুঃখ ভারাক্রান্ত দেখে। এই সংযোগ পুনঃস্থাপিত হইলেই বিশ্বচরাচর আনন্দময় বলিয়া অনুভূত হয়।

এইভাবে ভারতবর্ষে সাম্য ও মৈত্রীর ভাবধারা ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই ব্যাপারে মুসলমান পীর, ফকীর প্রভৃতির অবদানও মোটেই উপেক্ষণীয় নহে। বিশেষতঃ সুফী সম্প্রদায়ভুক্ত মহাজনেরা ধর্ম্মের সার্ব্বজনীন তত্ত্বগুলি সযত্নে প্রচার করিয়া সমাজে পারস্পরিক শান্তিস্থাপনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। শিখদিগের "গ্রন্থ সাহেবে" সেখ ফরিদ ও ভীখন নামক দুইজন মহাপুরুষের কতকগুলি বাণী লিপিবদ্ধ আছে। এই বাণীগুলির আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে ইঁহারা ধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্যের দিকেই সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। লোভ ও আসক্তিই সকল অশান্তির আধার এবং ভগবৎ-

প্রেম ও ভগবানে আত্মসমর্পণই মুক্তিলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা, এই উপদেশই ইঁহারা দিয়াছেন। এইরূপ আরও অনেক মহাত্মার নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। হিন্দুসমাজের উপরেও ইঁহাদের চরিত্র ও শিক্ষার প্রভাব বড় অল্প ছিল না। এমন কি, কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে সত্যপীর নামক কোনও মুসলমান ফকীরই আজিও বাঙ্গালা দেশে সত্যনারায়ণে রূপান্তরিত হইয়া হিন্দু সমাজে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। সত্যনারায়ণ পূজায় সিন্নির ব্যবস্থার নাকি ইহাই কারণ।

সে যাহাই হউক, মধ্য যুগের মহাপুরুষেরা যে ধর্ম্মপ্রাণতায় ও উচ্চতর আদর্শে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিলেন তাহার প্রভাবে ভারতবর্ষে কিছুদিনের জন্য এক নূতন ধর্ম্মোন্মাদনার সৃষ্টি হইল। বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্যে এই আন্দোলনের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সময়েই হিন্দি, পঞ্জাবী, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষাগুলি নূতন রূপ পাইয়া অভিনব ভাব-সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। সামাজিক জীবনেও এই প্রভাব বিশেষরূপে কার্য্যকরী হইল।

কিন্তু পূর্ব্বে বহুবার যাহা হইয়াছে কালক্রমে আবার তাহাই হইল। আবার ফিরিয়া আসিল সেই অন্ধ বিশ্বাস, সেই আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপে অত্যন্তানুরক্তি, সেই শুষ্ক, নীরস, বিধি-নিষেধাত্মক ক্রিয়াবহুল বিকৃত ধর্ম্ম। এই অবস্থার বিরুদ্ধে আবার প্রতিবাদ উঠিল ব্রিটিশ আমলে, প্রধানতঃ খৃষ্টান প্রচারকদিগের আক্রমণের ফলে। খৃষ্টান প্রচারকদিগের আক্রমণ হইতে হিন্দুর হিন্দুত্ব বজায় রাখিবার চেষ্টাতেই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উৎপত্তি। কিন্তু কেবলমাত্র খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রতিরোধেই সমস্যার সমাধান হইল না। পাশ্চাত্য সভ্যতার ব্যাপক আক্রমণ হইতে ভারতীয় সংস্কৃতিকে রক্ষা করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইল এবং এই চেষ্টাই স্বামী দয়ানন্দ প্রবর্ত্তিত আর্য্য সমাজের ও

স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের কার্য্যাবলীতে দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমানে আসিয়াছে যান্ত্রিক সভ্যতার চাপ এবং সমাজতন্ত্রবাদের নূতন সমস্যা। এই যান্ত্রিক সভ্যতার প্রতিক্রিয়ায়ই গান্ধীবাদের উৎপত্তি। ভারতের চিরাচরিত সাধন-সম্পদ তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি হইতে সমাজতন্ত্রবাদের সমাধানে কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিবে কে বলিতে পারে?
